# ৬.০৯ খোন্দকার বাড়ি – Bangla Library

# ৬.০৯ খোন্দকার বাড়ি – Bangla Library

**৬.০৯ খোন্দকার বাড়ি**



**খোন্দকার বাড়ি – ৮৯**

তীর নিক্ষেপকারী যে নারী তা বনহুর বুঝে নিয়েছে যখন জলাশয়ের ধারে পানি পান করার জন্য গিয়েছিলো সে। তীরফলকটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো বনহুর, দারুণ ক্রোধ আর আক্রোশে তার মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো। কিছু ভেবে নিলো সে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে পাথরখন্ডের আড়াল থেকে বেরিয়ে পাশের ঝোঁপের মধ্যে প্রবেশ করলো।

এখন বনহুর যে ঝোঁপটার মধ্যে এসে পৌঁছলো সেখান থেকে রহস্যময় গুহার উপরিভাগ দেখা যাচ্ছে না। তীর–ধনু ধারিণী নারীটিকেও নজরে আর পড়ছে না। বনহুর বুঝতে পারলো এখন সে নিশ্চিন্ত, কারণ সেও তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

এবার বনহুর অগ্রসর হতে লাগলো ঐ তীর–ধারিণীকে লক্ষ্য করে। কখনও বা হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও উবু হয়ে, কখনও সোজাভাবে।

গুহার পিছন অংশ দিয়ে বনহুরকে পর্বতটার উপরে উঠতে হবে, তাই সে ঐদিকে এগুতে লাগলো। খুব বেশি সময় লাগালো না, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পৌঁছে গেলো। সম্মুখে খাড়া দেয়ালের মত পাহাড়, ঐ খাড়া দেয়াল বেয়ে তাকে উপরে উঠতে হবে।

তবে মাঝে মাঝে দু'একটা ফাটল নজরে পড়ছিলো। বনহুরের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হলো, কারণ ঐ ফাটলগুলোর ধাপে ধাপে পা রেখে সে উপরে উঠতে পারবে। বনহুর বেশ ক্ষুধা বোধ করছিলো, তবু বিলম্ব না করে পর্বতের দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করলো। ফাটলগুলো থাকায় পর্বতে আরোহণ করতে তার খুব বেশি অসুবিধা হচ্ছে না।

পর্বতের গা বেয়ে মাঝামাঝি পৌঁছতেই ফাটলগুলো আর নজরে পড়ছে না। এদিকটা বেশ সমান, উঁচুনীচু খাড়া দেয়ালের মত।

রোদের তাপে শরীরটা ঘেমে নেয়ে উঠার মত হয়েছে। সুন্দর মুখমন্ডল ওর রাঙা হয়ে উঠেছে, বারবার বাম হাতের পিঠে কপাল থেকে গড়িয়ে পড়া ঘাম মুছে ফেলছিলো সে।

বনহুর যখন ভাবছে এবার কিভাবে উপরে উঠবে তখন হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটা শিকড় ধরনের শুকনো লতা ঝুলছে। আনন্দেদীপ্ত হয়ে উঠলো

তার চোখ দুটো। এবার সামান্য চেষ্টাতেই বনহুর গুহার উপরে অর্থাৎ পর্বতটার ঠিক মাথায় এসে পৌঁছলো।

সম্মুখে দৃষ্টি পড়তেই দেখতে পেলো এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সেই নারীমূর্তি, যে তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেছিলো।

বনহুর একটু জিরিয়ে নিলো, রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছিলো সে। পর্বতের সমতল খাড়া অংশ দিয়ে উপরে উঠে আসতে বেশ পরিশ্রম হয়েছে তার। বনহুর লক্ষ্য করলো এ নারীর হাতে এখনও তীর–ধনু আছে। সে পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে নিচে লক্ষ্য করছিলো, সেই মানুষটিকে পুনরায় দেখা যায় কিনা। দেখা গেলে সে পুনরায় তীর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করবে তাতে কোনো ভুল নেই।

নারীটার গোটা পিছন অংশ চুলে ঢাকা। সে এত গভীর এবং মনোযোগ সহকারে নিচে জলাশয়ের দিকে তাকিয়েছিলো যে, তার অন্য কোনোদিকে খেয়াল ছিলো না।

বনহুর জানে নারীটি যদি ফিরে দাঁড়ায় এবং তাকে দেখতে পায় তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। তীর বিদ্ধ করে হত্যা করবে। কোনো উপায় নেই তার বল থেকে নিজকে রক্ষা করার। বনহুর তাই মুহূর্ত বিলম্ব না করে অতি সন্তর্পণে নারীটিকে লক্ষ্য করে এগুতে লাগলো, যেন সে ফিরে তাকাবার পূর্বেই তার পাশে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

যা ভেবেছিলো তাই, বনহুর পিছনে এসে হাজির হলো ওর। এবার সে আচমকা জাপটে ধরে ফেললো অদ্ভুত সেই তীর–ধনু ধারিণী নারীটিকে।

নারীটি ভীষণভাবে চমকে ফিরে তাকালো। বনহুরের দৃষ্টি তীর–ধনু ধারিণীর মুখে পড়তেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো। অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো সেলুসি তুমি!

লুসি বনহুরকে চিনতে পারে না।

আর চিনবেই বা কি করে। লুসি যখন বনহুরের হাতের মুঠো থেকে ভয়ংকর জলপ্রপাতের মধ্যে ছিটকে পড়েছিলো তখন তার মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিলো না। তদুপরি সেই প্রবল জলোচ্ছাস। লুসি কি করে সেই ভীষণ অবস্থা থেকে রক্ষা পেয়েছে বা বেঁচে আছে তা কেউ জানে না। এমন কি লুসিও জানে না কি করে সে বাঁচলো।

জলপ্রপাতের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো। জ্ঞান হয়েছে যখন তখন সে নিজকে এক নির্জন বালুচরে দেখেছে। সে জায়গাটা কোথাও তাও লুসি জানে না, জানবার মত স্বাভাবিক জ্ঞানও তার ছিলো না।

অজ্ঞান থেকে সংজ্ঞা লাভ করেছিলো কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলো লুসি তার গত জীবন সম্বন্ধে সবকিছু। চোখ রগড়ে সে উঠে বসে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলো, শুধু জলরাশি আর বালুকাভূমি ছাড়া কিছুই তখন তার নজরে পড়েনি। তবে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেয়েছিলো পর্বতটাকে।

এক সময় উঠে দাঁড়িয়েছিলো, পা দু'খানা তার তখন মাতালের মত টলছিলো। লুসি তখন বাঁচতে চায়, সম্মুখে কিছু পেলে খাবে, নাহলে জীবন রক্ষা পাবে না তার।

কিন্তু কি খাবে, শুধু বালুর স্তর ছাড়া কিছু নেই। তখন প্রাণভরে পানি পান করেছিলো। পানি পান করে সে জীবনে বেঁচে গেলো তখনকার মত।

লুসি পানি পান করে অনেকটা সুস্থ বোধ করলো, যদিও তার মাথার উপর প্রচন্ড সূর্যের তাপ অগ্নিবর্ষণ করছিলো।

একটি অবুঝ শিশুও বাঁচতে চায়, ক্ষুধায় কাঁদে। লুসিও তেমনি কাঁদলো অনেক কিন্তু কে দেবে তাকে খাবার। কোনো কথাও সে স্মরণ করতে পারলো না–কে সে আর এখানে এলেই বা কি করে।

এক সময় লুসি পর্বতের পাশে এসে পৌঁছলো। হাতড়ে হাতড়ে একটা গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। সূর্যের প্রখর তাপ থেকে রক্ষা পেলো সে।

গুহার মধ্যে এগুচ্ছে লুসি।

একটা অদ্ভুত জন্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো তার। লুসি ভয়শূন্য হয়ে পড়েছিলো, যেহেতু সে তার স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো, তাই সে জন্তুটাকে দেখে সেদিন ভয় পায়নি। জন্তুটা আক্রমণ করবার পূর্বেই লুসি তাকে আক্রমণ করেছিলো। দাঁত–মুখ–নখ দিয়ে যুদ্ধ করেছিলো লুসি জন্তুটার সঙ্গে এবং তাকে পরাজিত করে তার মাংস সেদিন খেয়েছিলো সে।

এমনি করে নির্জন এই পর্বতের পাদমূলে নতুন জীবনের প্রথম অধ্যায় শুরু করেছিলো লুসি।

কাঁচা মাংস আর জলোচ্ছাসের পানি পান করে তার জীবন রক্ষা করছে। এমনি করে আজও বেঁচে আছে লুসি। তবে সে তীরধনু পেলো কোথায় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বনহুর যে গুহায় প্রবেশ করে অসংখ্য তীরফলক দেখতে পেয়েছিলো, লুসিও তাই পেয়েছে।

শুধু ধনুটা নিয়ে লুসি বেরিয়ে আসেনি, তার সঙ্গে বেশ কিছু তীরফলক নিয়ে এসেছে এবং সেই তীর দিয়ে লুসি হরিণ বা বুনো শূকর হত্যা করতে আর তাই সে খেতো।

মাঝে মাঝে লুসির একটু আধটু স্মরণে আসতো তার পূর্ব কথা কিন্তু ঠিক মনে পড়তো না সবকিছু। তবে একটু সে স্মরণ করতে পেরেছিলো তার নিজের নাম লুসি।

বনহুর যখন লুসিকে পিছন থেকে ধরে ফেলে তাকে চিনতে পেরে নাম ধরে ডাকলো, তখন লুসি অজানা এক লোকের মুখে তার নাম শুনে অবাক হলো। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর এক ঝটকায় ওর হাত থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বনহুর থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে ভাবতেই পারেনি এখানে সে লুসিকে আচম্বিতে দেখতে পাবে। বনহুর বুঝতে পারছে লুসি তাকে চিনতে পারেনি। আর পারবেই বা কি করে–যে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছাসে লুসি নিপতিত হয়েছিলো তাতে সে বেঁচে আছে ভাবাই যায় না।

বনহুর ভাবলো লুসি নিশ্চয়ই পুনরায় ফিরে আসবে কিন্তু সে আর এলো না। বনহুর ওকে পাকড়াও করে প্রথমেই ওর হাত থেকে তীর–ধনু কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো পর্বতের নিচে খাদের মধ্যে, যেন লুসি আবার তীর–ধনু হাতে না পায়। বনহুর সে কারণে নিশ্চিন্ত হলো, নাহলে লুসি তাকে আড়াল থেকে তীরবিদ্ধ করতে ছাড়তো না।

বনহুর লুসির সন্ধানে এগুলো যেদিকে লুসি চলে গিয়েছিলো সেইদিকে। কিন্তু লুসিকে দেখতে পেলো না সে।

ভাবতে লাগলো বনহুর, তবে লুসি গেলো কোথায়। এদিকে ক্ষুধায় তার পেট চো চো করছে। কয়েক ঘন্টা শুধু পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলো সে। বনহুর ক্ষুধা নিবারণের জন্য কিছু সন্ধান করতে লাগলো।

উঁচুনিচু স্থানগুলো অতিকষ্টে পার হয়ে অর্ধ–সমতল এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো বনহুর এ জায়গাটা সবচেয়ে বেশি উঁচু। তবে এ জায়গায় বেশ ঘন জঙ্গল আছে। জঙ্গলে অনেক রকম গাছপালা নজরে পড়লো।

বনহুর গাছে গাছে তাকিয়ে দেখতে লাগলো কোনো ফলের গাছ নজরে পড়ে কিনা।

হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো নিচে এক স্থানে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো বনহুর–লুসি একটা হরিণ–চামড়া রোদে শুকিয়ে পাথরে রগড়াচ্ছে। বনহুর বুঝতে পারলো তার পরনে যেমন একটা হরিণ চামড়া রয়েছে, তেমনি আর একটা তৈরি করছে সে।

বনহুর লুসির কাজ দেখে অবাক না হয়ে পারলো না।

লুসি যখন প্রচন্ড জলোচ্ছাসে নিপতিত হয়েছিলো তখন তার পরনে ছিলো একটা প্যান্ট ও জামা।

তারপর যখন সে এই পর্বতে এসে আশ্রয় নিলো তখন ঐ পোশাকই ছিলো সম্বল। দিন কাটতে লাগলো, লুসির পোশাক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। একদিন একেবারে পরার অনুপযোগী হয়ে পড়লো তার পরিহিত জামা প্যান্ট।

লুসির স্বাভাবিক জ্ঞান না থাকলে সে এটুকু বুঝতে বা জানতো তার লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজন। তাই সে তীর–ধনু দিয়ে হরিণ শিকার করতো এবং তার মাংস খেতো আর ঐ চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরি করে নিয়ে পরতো।

লুসির কাঁচা খেতে প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো, এখন আর লাগে না অভ্যাস হয়ে গেছে।

বনহুর এখনও তাকিয়ে আছে লুসির দিকে কি করে সে দেখতে চায়। লুসি হরিণের চামড়াখানা বুকের সঙ্গে বাঁধলো, তারপর উঠে দাঁড়ালো। এগুতে লাগলো সে দ্রুত একদিক ধরে।

লুসি চলার সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো, হয়তো সে ভাবছিলো আবার ঐ মনুষ্যনামী জীবটা তাকে ধরে ফেলবে নাতো।

অবশ্য লুসির চিন্তা মিথ্যা নয়, বনহুর লুসিকে পাকড়াও করবার জন্য আড়ালে আত্মগোপন করে ক্ষিপ্রগতিতে এগুতে লাগলো।

লুসি ঝোঁপঝাড় অতিক্রম করে সম্মুখদিকে চলেছে। হয়তো পর্বতের ঐ অংশে যাচ্ছে, যে অংশ থেকে লুসি প্রথম মানুষটাকে দেখেছিলো।

লুসি নিজেও মানুষ বটে কিন্তু সে এখানে আসার পর দীর্ঘদিন ধরে কোনো মানুষনামী জীব দেখতে পায়নি। তাই হঠাৎ করে নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। মনে করেছিলো সে একটাই এই পর্বতের মানুষ।

নিরাপদ ছিলো না কোনোদিন লুসি, বিপদ আসতে প্রায়ই, সে জন্য লুসি প্রস্তুত থাকতো সর্বদা। মানুষকে লুসি বেশি ভয় করতো, ঘৃণাও করতো। মানুষ যতখানি হিংস্র ততখানি বুঝি বনের জানোয়ারগুলোও নয়। লুসি এসব বিপদকে আমলই দিত না, জীবজন্তুর আক্রমণ তার কাছে সাধারণ ব্যাপার, সর্বক্ষণ তীর–ধনু থাকতো তার হাতে, ঐ তীর–ধনু দিয়ে সে ঘায়েল করতো জীবজন্তুগুলোকে।

লুসি যখন দ্রুত এগুচ্ছে, বনহুর তখন আড়ালে অতি সন্তর্পনে তার পিছু পিছু চলেছে।

এক সময় একেবারে লুসির কাছাকাছি এসে পড়ে বনহুর। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সম্মুখে এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লুসি, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় সে বনহুরের দিকে।

বনহুর আনন্দভরা কণ্ঠে বলে উঠলো–লুসি, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?

লুসি নীরব, কোনো কথা সে বললো না।

বনহুর বললো–তুমি এখানে কি করে এলে বলল, বলো লুসি?

লুসি তবু নীরব।

বনহুর বললো–তুমি কি কথা বলতে পারছে না?

এবারও কোনো জবাব দিলো না সে।

বনহুর বুঝতে পারলো লুসি স্বাভাবিক সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছে, অবশ্য প্রথম দর্শনে যখন লুসিকে সে পিছন থেকে আচমকা ধরে ফেলেছিলো তখন বনহুর মনে করেছিলো হয়তো ভুলে গেছে তার কথা কিংবা হঠাৎ করে চিনতে পারছে না তাকে, এবার সে চিনতে পারবে।

কিন্তু লুসি এবারও নীরব।

বনহুর তার মুখোভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো লুসি তাকে কোন রকমেই স্মরণে আনতে পারছে না। বনহুর নিজেও ভাবতে পারেনি এখানে সে লুসিকে দেখতে পাবে। লুসির জন্য তার মনে ভীষণ একটা দুঃখ এবং ব্যথা ছিলো, যে দুঃখ–ব্যথা বনহুর মন থেকে কোনো সময় মুছে ফেলতে পারতো না, কারণ লুসি তাকে নরপশু রাত্রির ভয়ঙ্করের কবল থেকে রক্ষা করেছিলো। শুধু রাত্রির ভয়ঙ্কর নয়, শয়তান রিজভীর মৃত্যুছোবল থেকে তাকে রক্ষা করে নিয়েছিলো নিজের অমূল্য রত্ন বিসর্জন দিয়ে। আজ সেই লুসিকে বনহুর ফিরে পেয়েছে, এটা কম আনন্দের বিষয় নয়। বনহুর লুসিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। হাত ধরে বললো–লুসি, আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখো, দেখি আমাকে তুমি চিনতে পারো নাকি?

লুসি তবু কোনো কথা বলে না, সে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় বনহুরের দিকে।

বনহুর নিজে বসে ওকে বসিয়ে দেয় নিজের পাশে, তারপর বলে– লুসি, তুমি কি করে জীবনে বাঁচলে বলো, বলল লুসি?

লুসি তবু নীরব।

বনহুর ওর মুখে কথা ফোঁটানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে কিন্তু কোনো ফল হয় না, লুসি কোনো কথাই বলে না। বনহুরের কথা সে বুঝতেও পারে কিনা সন্দেহ। বনহুর যখন কথা বলে তখন লুসি শুধু থ মেরে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

অনেক সন্ধান করেও কোনো ফলের গাছ পেলো না বনহুর যা খেয়ে সে বাঁচতে পারে। ক্ষুধার জ্বালা তাকে অনেকটা কাতর করে তুললো। এদিকে লুসিকে বনহুর

সর্বক্ষণ দৃষ্টির মধ্যে রেখেছে। ও কি খেয়ে বেঁচে আছে বনহুর তাই দেখতে চায় বা জানতে চায়।

বনহুর একটু আড়ালে সরে গেলো এবং নজর রাখলো আড়াল থেকে।

লুসি চারদিকে তাকিয়ে দেখলো মানুষনামী জীবটা আশে পাশে নেই, তখন সে এগুলো একদিক লক্ষ্য

বনহুর ওকে অনুসরণ করলো।

লুসি এগিয়ে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে বনহুর জানে না তবুও সে তাকে অনুসরণ করে এগুতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা অসমতল জায়গায় এসে দাঁড়ালো সে, আশেপাশে অনেকগুলো পাথরখন্ড ছড়ানো আছে।

লুসি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো তারপর একটা পাথরখন্ড সরিয়ে কিছু একটা জিনিস তুলে নিলো হাতে। লুসি এবার সেই জিনিস বা বস্তু খেতে লাগলো গোগ্রাসে।

বনহুর আড়াল থেকে চুপি চুপি দেখতে লাগলো সবকিছু। খাওয়া শেষ হলে সে পুনরায় পাথরখন্ড চাপা দিলে ঐ গর্তটার মুখে। উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো লুসি, তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পর্বতের পিছন অংশের দিকে পা বাড়ালো।

লুসি সরে যেতেই বনহুর সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হলো এবং ঐ পাথরখটা সরিয়ে ফেললো দু'হাতে। বেশ ভারী ছিলো ঐ পাথরখন্ডটা।

বনহুর বুঝতে পারলো লুসির দেহের শক্তি কমেনি, কারণ এ পাথরখন্ড সরিয়ে ফেলার সামর্থ্য সবার হবে না। পাথরখন্ড সরিয়ে ফেলতেই অবাক হলো বনহুর, গর্তের মধ্যে রয়েছে একটা মৃত হরিণের দেহ।

হরিণটার পচা মাংসই লুসি খেয়েছিলো হৃষ্ট চিত্তে। বনহুর বুঝতে পারলো লুসি এই নির্জন পর্বতশৃঙ্গের নিভৃতে কি খেয়ে বেঁচে আছে।

লুসির মত অবস্থায় এখনও পৌঁছায়নি বনহুর, তাই সে ঐ হরিণের পচা মাংস খেতে পারলো না। যদিও ক্ষুধায় তার নাড়িভুড়ি হজম হবার যোগাড় হয়েছে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো এ সময় তার নজরে পড়লো দূরে কয়েকটা ঝোঁপঝাড়, লতাগুল্ম। আরও নজরে পড়লো লতাগুলোর ফাঁকে বেশ বড় বড় কিছু দেখা যাচ্ছে। মনে হলো কতকগুলো বেশ হলুদ রঙের ফল ঝুলছে।

অনেক পাখি ভিড় করে সেই ফল খাচ্ছে। বনহুর এগিয়ে এলো, ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে বেশ কিছু লতার মত গাছ তার নজরে পড়লো। ঐ হলুদবর্ণ ফলগুলো লতাগাছের ফল বুঝতে পারলো সে।

নানা ধরনের বন্য পাখি হলুদ ফলগুলো ঠোকর দিয়ে দিয়ে খাচ্ছে। বনহুর ভাবলো, বিষাক্ত ফল হলে পাখিগুলো নিশ্চয়ই খেতো না। তবে কিছু কিছু ফল সবুজ বর্ণ, সেগুলো বোধ হয় কাঁচা হবে।

বনহুর ঝোঁপটার পাশে সরে আসতেই অদ্ভুত পাখিগুলো চিৎকার করে উঠলো কেউ বা পাখার ঝাপটানি দিয়ে উড়ে পালালো।

বনহুর একটা ফল ছিঁড়ে নিলো হাতে, তারপর ফলটার খোসা ছাড়িয়ে মুখে দিলো। চমৎকার ফল তো! আপন মনেই বললো বনহুর। একটু টক অথচ বেশ মিষ্টি স্বাদ কতকটা পাকা আনারসের মত, গন্ধও তেমনি। বনহুর যত পারলো পেট পুরে খেলো। ফল তার প্রিয় খাদ্য, তাই সে বেশ কয়েকটা ফল খেলো।

বনহুর তৃপ্তি সহকারে ফল খেয়ে ফিরে দাঁড়াতেই মনে পড়লো লুসির কথা। লুসি গেলো কোথায়। বনহুর ওর সন্ধানে চারিদিকে লক্ষ্য রেখে এগুতে লাগলো। যে জায়গাটা সবচেয়ে উঁচু, সেখানে এসে দাঁড়াতেই তার নজরে পড়লো পর্বতের উঁচুনীচু শৃঙ্গগুলো, বেলাশেষের রোদ ঝকমক করছে। হঠাৎ দেখলো লুসি পর্বতের গা বেয়ে নিচে নামছে কখনও বা শিকল বেয়ে, কখনও গাছের ডাল ধরে, আবার কখনও হামাগুড়ি দিয়ে।

ভীষণভাবে চমকে উঠলো বন, কারণ লুসি যেভাবে দ্রুত পর্বতের গা বেয়ে নিচের দিকে নামছে তাতে যে কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়তে পারে। নিচে গভীর খাদ, কোনোক্রমে পা ফসকে গেলে আর রক্ষা নেই–মৃত্যু অনিবার্য।

বনহুর শিউরে উঠলো ওর চলার অবস্থা দেখে। এই তত পড়ে যায় আর কি! বনহুর ওকে ধরে ফেলার জন্য দ্রুত লুসির দিকে দৌড় দিলো। তবে লুসি যেন

তাকে দেখতে না পায় এ জন্য সাবধানে চললো। হঠাৎ যদি তার প্রতি নজর পড়তেই গড়িয়ে পড়ে কিংবা হোঁচট খায় তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

এটা তো সমতলভূমি নয়, উঁচুনীচু পাথুরিয়া জায়গা, তা ছাড়া এক পাশে গভীর খাদ। বনহুর সাবধানে এবং সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে লুসির কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হলো। কিন্তু লুসি তখন এমন জায়গায় যে জায়গাটা অত্যন্ত খাড়া এবং পিচ্ছিল।

বনহুর থমকে দাঁড়ালো।

লুসি তখনও নামছে।

বনহুর ভেবে পেলো না লুসি কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। তবে যতদূর সম্ভব বনহুরের দৃষ্টির আড়ালে সে যেতে চায় এবং ঐ কারণেই সে পর্বতের সম্মুখে ঢালু পথ ধরে না নেমে পিছন অংশের খাড়া ধার বেয়ে নামছে। কিন্তু লুসি জানে না, তার তেমন বোঝার ক্ষমতাও নেই যে, এদিক দিয়ে নামতে যাওয়া মানে বিরাট বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেওয়া।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে কেন লুসি তাকে এড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সে তত লুসির কোনো ক্ষতি করেনি বা করতে চায় না। আজ যদি লুসির স্বাভাবিক সংজ্ঞা থাকতো তাহলে সে কিছুতেই থাকে ত্যাগ করে চলে যেতো না বা পালাতে চেষ্টা করতো না। লুসি বনহুরকে পেয়ে কত না খুশি হতো কিন্তু সে আজ পালাতে চায় তার সান্নিধ্য থেকে।

বনহুর লক্ষ্য করলো লুসি এখনও নামছে। তাকে ধরবে বা সহায়তা করবে তারও কোনো উপায় নেই। ভীষণ উদ্বিগ্নতা নিয়ে বনহুর ওর দিকে দ্রুত এগুতে লাগলো। কিন্তু কিছুটা না এগুতেই বনহুর চিৎকার করে উঠলো। যা আশংকা করেছিলো তাই হলো–লুসি একটা পাথরসহ গড়িয়ে পড়লো পর্বতের শৃঙ্গ থেকে নিচে গভীর খাদটার মধ্যে।

বনহুর নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গেলো। দুহাত দিয়ে চোখ দুটোকে ঢেকে ফেললো।

কিছুক্ষণ পর সে ধীরে ধীরে চোখ থেকে হাত দুখানা সরিয়ে নিয়ে পর্বতের শৃঙ্গ থেকে নিচে গভীর খাদের মধ্যে তাকালো। কিছু নজরে পড়লো না সেখান থেকে।

কারণ খাদটা ছিলো হাজার হাজার ফুটে নিচে। লুসির শেষ পরিণতি দেখে বনহুর মর্মাহত হলো।

এবার বনহুর দ্রুত নেমে চললো নিচে, অবশ্য যেদিক দিয়ে লুসি নামছিলো সেদিক দিয়ে নয়, অপরদিক দিয়ে নিচে নামতে লাগলো সে।

বেশ কিছু সময় লাগলো বনহুরের নিচে নেমে আসতে। পাথর খন্ডের ধাপে ধাপে পা রেখে যতদূর সম্ভব দ্রুত এলো বনহুর সেই খাদটার পাশে।

ছোটবড় অগণিত পাথরখন্ডে ভরা সেই গভীর খাদ।

সূর্যের আলোতে বনহুর তাকিয়ে দেখলো নিচে খাদের মধ্যে লুসি পড়ে আছে, রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে তার মাথার দিকটায়।

বনহুর পাখরখন্ডে পা রেখে নেমে এলো নিচে খাদের মধ্যে লুসির ঠিক পাশে। লুসির বিকৃত মাথাটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো বনহুর। আবার সে দুহাতে চোখ দুটোকে ঢেকে ফেললো।

কতক্ষণ পর চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে আবার সে তাকালো লুসির বীভৎস রক্তাক্ত মৃতদেহটার দিকে। লুসির মাথাটা সম্পূর্ণ থেতলে গেছে। যে পাথরখন্ডটার উপর মাথাটা পড়েছিলো সেই পাথরখন্ডটা রক্তে লালে লালে লাল হয়ে গেছে।

বনহুর নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছু সময়, তারপর লুসির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওর দেহটা তুলে নিলো হাতের উপর, অদূরে একটি গর্তের মত জায়গায় লুসির প্রাণহীন দেহটা রেখে কয়েকটা পাথর চাপা দিলো, তারপর সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলল লুসি, তুমি আমার জীবন থেকে অনেকদিন আগে মুছে গিয়েছিলো, আবার কেন তুমি আমার মনকে বিচলিত করলে, কেন আমাকে মর্মাহত করলে?

দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো বনহুরের চোখ থেকে।

হাতের পিঠে গন্ডের পানি মুছে নিয়ে বনহুর তাকালো মাথার উপরে সচ্ছ আকাশের দিকে। তারপর ফিরে তাকালো লুসির পাথরচাপা কবরটার দিকে। আপন মনে বললো বনহুর–লুসি, তুমি এখানে ঘুমিয়ে থাকো, কেউ জানবো না

কেউ দেখবে না, শুধু ঐ আকাশ আর এই পর্বত তোমার সঙ্গী হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে।

*

গভীর রাতে অশ্বপদ শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে নূরীর। অশ্বপদ শব্দ চিনতে তার বাকি ছিলো না, এ অশ্বপদ শব্দ তাজের। তাজের কথা মনে পড়তেই চমকে উঠলো নূরী, তাজ আজ দুদিন হলো নিখোঁজ হয়েছিলো, অনেক সন্ধান করেও তাজকে তারা খুঁজে পায়নি।

তাজের খুরের আওয়াজ শুধু নূরীর কানেই পৌঁছালো না, বনহুরের সব অনুচররের কানেই তাজের খুরের প্রতিধ্বনি বিস্ময় জাগালো। সবাই আস্তানার বাইরে বেরিয়ে এলো, কারণ তাজ ফিরে আসছে। সে কোথায় উধাও হয়েছিলো কে জানে।

মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ফুল্লরা, সেও যেমন সবার সঙ্গে সর্দারের জন্য ব্যাকুল হয়ে ভাবছে। তাজের নিখোঁজ তার শিশু মনেও একটা আলোড়ন জাগিয়েছিলো। এক্ষণে মায়ের মুখে একটা উদ্বিগ্নতার ভাব লক্ষ্য করে সেও বিচলিত হয়ে পড়েছিলো। ঘুম ছেড়ে তাই ফুল্লরা মাকে অনুসরণ করে বাইরে এসেছে।

নাসরিনও কন্যাকে কাছে টেনে নিয়ে তাকিয়েছিলো সম্মুখে, পাশেই নূরী, তার চোখেমুখে ভীষণ একটা চঞ্চলতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

বনহুরের অনুচর সবাই এসে জড়ো হয়েছে।

অশ্বপদশব্দ ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে।

ততই উদ্বিগ্নতা বাড়ছে সবার মনে।

তাজের খুরের আওয়াজ আজ সকলের মনে নতুন এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

কোথায় গিয়েছিলো তাজ, আবার এমনভাবে কোথা থেকেই বা সে ফিরে আসছে। তার পিঠে কি কেউ আছে, সবার মনেই এক গভীর চিন্তাধারার প্রবাহ।

হঠাৎ সবার চোখে ফুটে উঠে আনন্দোচ্ছাস। তারা জোছনার আলোতে দূর থেকে দেখতে পায় তাজের পিঠে বসে আছে তাদের হারানো রত্ন অমূল্য সম্পদ স্বয়ং সর্দার।

নূরী আনন্দধ্বনি করে উঠলো–হুর আমার হুর! আমার হুর বেঁচে আছে!

সমস্তদ অনুচর হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

ফুল্লরা করতালি দিয়ে লাফিয়ে উঠলো সর্দার আসছে......সর্দার আসছে......

ততক্ষণে বনহুর তাজের পিঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে নিজের অনুচরদের মাঝে। সবার চোখেমুখে বিস্ময়, দীঘির গভীর জলের অতলে যে সর্দার তলিয়ে গেলো কি করে সে ফিরে আসতে পারে, কি করেই বা সে বেঁচে আছে এবং আস্তানার বাইরে গিয়েছিলো। সবাই ঘিরে ধরে বনহুরকে।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াতেই নূরী ঝাঁপিয়ে পড়লে তার বুকে। অস্ফুট কণ্ঠে বললো– তুমি জীবিত আছো হুর! তুমি জীবিত আছো......

হাঁ নূরী, আল্লাহ আমাকে জীবিত রেখেছেন।

অনুচরগণ সবাই কুর্ণিশ জানালো। তাদের চোখেমুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে। সর্দারকে ফিরে পেয়ে তারা যেন মৃতদেহে প্রাণ ফিরে পেলো।

নূরী সহ বনহুর নাসরিন আর ফুল্লরার পাশে এসে দাঁড়ালো।

দু'জন অনুচর বনহুরের পরিচ্ছদ এনে ধরলো তার পাশে। বনহুর স্লিপিং গাউন জাতীয় পরিধেয় বস্ত্রটা টেনে নিয়ে পরে নিলো গায়ে, কারণ তার দেহে সাঁতারের হাল্কা পোশাক ছাড়া কিছু ছিলো না।

বনহুর ফুল্লরার চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে একটু আদর করে নিলো, তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে বললো–জানি তোমরা আমার জন্য ভীষণ ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছিলে, কারণ যে অবস্থায় আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

বনহুর সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে সবাইকে বললো।

নূরী তো একেবারে হতবাক হয়ে গেছে।

বনহুরের অন্যান্য অনুচর সবাই বিস্মিত।

বৃদ্ধা দাইমা এলো, সে সব শুনে বললোআমি যে কাহিনী সেদিন নুরীর কাছে বলেছি ঠিক তার শেষ অংশ সর্দার তুই দেখেছিস ঐ রহস্য গুহায়।

বনহুর এবার ফুল্লরাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো–ফুল, তুমি আমার কাছে কি নেবে বলেছিলে?

ফুল্লরা চট করে বলে উঠলো–আমি নীলমনি হার চেয়েছিলাম। সর্দার তুমি বলেছিলে দেবে?

হাঁ, তোমার জন্য আমি নীলমনি হারমালা এনেছি। কথাটা বলে বনহুর তার জামার নিচে সাতারু পোশাকে পকেট থেকে রহস্য গুহায় কঙ্কালের গলায় পাওয়া সেই নীলমনির হারছড়া বের করে ফুলরার গলায় পরিয়ে দিলো।

বৃদ্ধার ঘোলাটে চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, সে প্রায় চিৎকার করে বললো–এ হার আমার অতি পরিচিত। আমি মহারাণীর গলায় এ হার দেখেছিলাম। ছোট ছিলাম তবু আমার চোখের সামনে ভাসছে মহারাণীর মুখখানা। বাবার রথে চেপে মহারাণী ঐ হার গলায় পরে রাজভ্রমণে বের হতো। আমি চিনতে ভুল করিনি, আমি চিনতে ভুল করিনি.....বৃদ্ধা ফুরাকে কাছে টেনে নিয়ে হারছড়া অবাক হয়ে দেখতে লাগলো নিপুণ দৃষ্টি মেলে। তার দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে বিস্ময়।

ফুল্লরার আনন্দ আর ধরে না, নীলমনি হার তার গলায় ধপ দপ্ করে জ্বলছিলো। অদ্ভুত মানিয়েছে ফুল্লরাকে।

নাসরিনের মুখমন্ডল আনন্দদীপ্ত, সে নির্বাক হয়ে গেছে–সর্দার নিজের হাতে ফুল্লরাকে মালা পরিয়ে দিয়েছে।

নুরীসহ সবাই আনন্দিত, মুগ্ধ, নীলমনি হার আজ ফুরার গলায় শোভা পাচ্ছে।

বনহুর ফিরে আসায় চললো আনন্দ উৎসব।

আস্তানা মুখর হয়ে উঠলো।

নূরীর চোখেমুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

এক সময় যখন বনহুরকে নূরী নিভৃতে পেলো তখন ওর জামার আস্তিন চেপে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললো–হুর, তুমি ফিরে এসেছে, তাই তোমার আস্তানা আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে কিন্তু তোমার মুখ তবু প্রসন্ন নয়। কেন, কি হয়েছে তোমার বলো?

বনহুর সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোয়া ছুঁড়ে বললো– নূরী, আমি ভয়ঙ্কর এক অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়েছি সত্য কিন্তু আমার জীবনে এক গভীর বেদনার উদ্ভব হয়েছে, তা হলো আমার জীবন রক্ষাকারিণীর মৃত্যু।

নূরী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–জীবন রক্ষাকারিণী কে সে–আশার কথা বলছো তুমি?

না, তার নাম লুসি।

লুসি!

হাঁ।

সে তোমার জীবন রক্ষা করেছিলো–কই বলোনি তো?

লুসি নিজের ইজ্জৎ বিসর্জন দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছিলো। নূরী, সে এক বিরাট ভয়ঙ্কর কাহিনী। সেদিন মৃত্যু আমার অনিবার্য ছিলো কিন্তু ঐ লুসির বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে..........একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো বনহুর, তারপর সেদিনের ঘটনাটা বললে নূরীর কাছে। ........সিকে হারিয়েছিলাম অনেকদিন পুর্বে। ভীষণ এক জলপ্রপাতের গভীর অতলে তলিয়ে গিয়েছিলো সে। সেদিন ব্যথা পেয়েছিলাম অনেক, লুসির মৃত্যু আমার হৃদয়কে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দিয়েছিলো। থামলো বনহুর, তারপর পুনরায় বলতে শুরু করলোলুসিকে আবার জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবো ভাবতে পারিনি কোনোদিন। কিন্তু তাকে আবার দেখলাম সেই রহস্যময় পর্বতে। প্রথম দেখে চিনতেই পারিনি, ভেবেছিলাম হয়তো কোনো জংলী মেয়ে হবে কিন্তু যখন তাকে সামনা সামনি দেখলাম তখন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, দেখলাম হরিণ চামড়া পরিহিতা নারী অন্য কেউ নয়, লুসি। সেই ভয়ঙ্কর জলপ্রপাতে নিমজ্জিত লুসি। কি করে সে জীবনে

বেঁচেছে ভেবে পেলাম না। লুসিকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু সে আমাকে চিনতে পারেনি, আমাকে দেখেই সে ছুটে পালালো। আমি তাকে কিছুতেই রুখতে পারলাম না।

তারপর দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করলো নূরী।

বনহুর উদাস কণ্ঠে বললো–লুসি আমাকে শত্রু ভেবে উঠিপড়ি করে আমার দৃষ্টির আড়ালে পালাতে লাগলো। আমি যদিও তাকে ফলো করে দ্রুত এগুতে লাগলাম কিন্তু উঁচু–খাড়া–অসমতল জায়গার জন্য যতদূর সম্ভব দ্রুত ছুটে গিয়েও তার নাগাল পেলাম না। সহসা এক সময় লুসি গড়িয়ে পড়লো পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে নিচে গভীর খাদের মধ্যে।

সর্বনাশ।

হাঁ, আমি যখন লুসির পাশে গিয়ে পৌঁছলাম তখন যে দৃশ্য আমি দেখলাম তা কোনোদিন ভুলতে পারব না! আনমনা হয়ে গেলো বনহুর, তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

নূরী বুঝতে পারলো বনহুরের আনমনা হওয়ার কারণ, আস্তানায় ফিরে আসার পর থেকে কেমন যেন উদাসী লাগছিলো তাকে। বললো নূরীলুসির মৃত্যু ঘটেছে?

হাঁ, সে মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর, অতি মর্মান্তিক তারপর কি করলে তুমি?

লুসির মৃতদেহ পাথর চাপা দিয়ে ওকে কবর দিলাম। তারপর নেমে এলাম নিচে খাদের বাইরে। রহস্যগুহার সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই নজরে পড়লো তাজ দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যি!

হ নূরী, নিজের চোখকে রগড়ে নিয়ে তাকালাম, কারণ ভাবলাম হয়তো মনের ভ্রম কিন্তু তা নয়, সত্যিই তাজ অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তখনও নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যেমনি শিস দিলাম অমনি তাজ আমাকে দেখতে পেলো এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। তখন আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছো–উচ্ছল আনন্দে ভরে উঠলো, অসময়ে আমি

তাজকে পাবো ভাবতেই পারি না। মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম লুসির ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা।

বনহুর যখন নূরীর কাছে তার রহস্য গুহার অদ্ভুত কাহিনী বলছিলো তখন ফুল্লরা নীল মনিহার গলায় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত তখন ভোর হয়ে গেছে। গাছে গাছে পাখির কলরব। কখন সে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসে আস্তানার বাইরে।

বনহুরের অনুচরদের মধ্যে একজনের ঐ নীল মনিহার দেখে লোভ হয়, সে জানতো নীলমনি সাত রাজার ধন। তাই সে ফুল্লরার দিকে লক্ষ্য রেখেছিলো এবং পিছু নিয়েছিলো।

ফুল্লরা যখন ঐ হার গলায় আস্তানার বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো তখন সে ফুল্লার পাশে এসে দাঁড়ায়।

ফুল্লরা ওকে দেখে বলে–তুমি কেন এলে?

অনুচরটির নাম ছিলো মালোয়া, বললো–ফুল, তুমি একা একা বাইরে এসেছে, তাই সর্দার আমাকে পাঠালো তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

না, আমি এখন ফিরে যাবো না।

তবে কোথায় যাবে?

জাভেদের কাছে।

জাভেদের কাছে যাবে?

হাঁ, আমি এ নীল মনিহার তাকে দেখাবো। কত সুন্দর আমার নীল মনি হার! জাভেদ কোথায় আছে তুমি জানো?

লোলুপ দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলো ঐ হারছড়ার দিকে, বললো সে–হা জানি। যাবে তার কাছে?

বললো ফুল্লরা–যাবো।

বনহুরের অনুচরগণ ছিলো লোভ–লালসাহীন। কিন্তু মালোয়ার মনের মধ্যে ছিলো লোভ–লালসা। যদিও সে নিজকে সংযত করে রাখতে অত্যন্ত কঠিনভাবে। মালোয়া জানতো, সর্দার যদি তার লোভের কথা জানতে পারে তাহলে আর রক্ষা নেই, যে কোনো মুহূর্তে তাকে হত্যা করবে তাতে কোনো ভুল বা সন্দেহ নেই।

এত জেনেও মালোয়ার লোভ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সে ফুল্লরাকে তুলে নিলো নিজের ঘোড়ার পিঠে।

ফুল্লরা বললো–সত্যি তুমি আমাকে জাভেদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে মালোয়া?

হাঁ।

মালোয়া ফুল্লরাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে নিজেও চেপে বসলো। ঘোড়া এবার তীরবেগে ছুটতে লাগলো।

*

মালোয়া ফুল্লরাকে নিয়ে হাজির হলো কম জঙ্গলে। ঝাম জঙ্গলে বাস করতো দস্যু নীরুসিং। মালোয়ার এক সময় নীরুসিংয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিলো, কোনো কারণে সে নীরুসিংয়ের দল থেকে বিদায় নিয়েছিলো, তারপর আর সে ফিরে আসেনি।

ঝাম জঙ্গলের গভীর অভ্যন্তরে ছিলো নীরুসিংয়ের আড্ডাখানা। দুর্দান্ত নীরুসিংয়ের অত্যাচারে ঝামবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। পথচারীর কোনো সময় নির্ভয়ে ঝাম জঙ্গলের পাশ দিয়ে পথ চলতে পারতো না।

নীরুসিংয়ের দল সব সময় রাহাজানি খুন খারাবি করে চলেছে। কুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে মাঝে মাঝে সর্দারের অনুচরদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, এমন কি মারপিট হতো।

মালোয়া ফুল্লরাকে নিয়ে পৌঁছলো ঝাম জঙ্গলে, দস্যু নীরুসিংয়ের আড্ডায়। তখন নীরু আর অনুচরগণ কোনো জায়গায় দস্যুতা করে ফিরে এসেছে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে মালোয়া ফুল্লরাকে দুহাতের উপর নিয়ে প্রবেশ করলো নীরুসিংয়ের আড্ডাখানায়।

নীরুসিং ও তার দলবল চমকে উঠলো।

নীরু সিং কিছু বলবার পূর্বেই তার দৃষ্টি পড়লো ফুল্লরার গলায় নীলমনি হারটার উপর। বিস্ময় নিয়ে এগিয়ে এলো সে মালোয়ার দিকে।

মালোয়াকে প্রথম নজরেই নীরুসিং চিনতে পেরেছে। সে তার দল ত্যাগ করে চলে যাবার পর নীরু ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক সন্ধান করেছিলো মালোয়ার কিন্তু মালোয়ার নিখোঁজ ছিলো। সে গোপনে যোগ দিয়েছিলো বনহুরের দলে। অবশ্য বনহুর নিজে মালোয়াকে দলে গ্রহণ করেনি, করেছিলো কায়েস। কায়েস মালোয়ার আসল রূপ জানতো না।

নীরু অনেকদিন পর মালোয়াকে দেখে ক্রুদ্ধ হবার পরিবর্তে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো, কারণ মালোয়র কোলে ফুল্লরার গলার মালার প্রতি তার নজর পড়েছিলো। এগিয়ে এসে মালোয়ার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ফুল্লরার গলার মালার নীলমনি হারটা হাতে উঁচু করে ধরে বললো–এ মালাসহ মালা তুমি কোথায় পেলে মালোয়া?

মালোয়া ডগমগ হয়ে বললো–এ জন্যই তো আমি তোমার দল ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। শপথ করেছিলাম যদি ফিরি তবে সাত রাজার ধন নিয়েই ফিরবো।

ফুল্লরার কচি মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। আজ দু'দিন অবিরাম অশ্ব চালিয়ে মালোয়া তাকে নিয়ে ঝামদেশে পৌঁছেছে। দু'দিনের মাঝে পথে এক রাত কেটে গেছে তাদের।

ফুল্লরা বেশি কিছু বুঝতে না পারলেও একটুকু বুঝতে পেরেছে যে, মালোয়া তাকে জাভেদের কাছে। নিয়ে যাবার নাম করে অন্য কোথায় দিয়ে চলেছে। মালোয়র কথায় কেন সে বিশ্বাস করেছিলো, এ জন্য ফুল্লরা অনেক কেঁদেছে।

ফুল্লরা যখন কেঁদেছে তখন মালোয়া তার গলা টিপে ধরে হত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছে, তাই ফুল্লরা কাঁদতে পারছে না আর। ফুল্লরা নির্বাক হয়ে গেছে একেবারে।

এমন দৈত্যরাজের মত নরপশু নীরুসিং ও তার দলবলকে দেখে ফুল্লরার কচি মুখ শুকিয়ে গিয়েছিলো, না জানি এ কোন জায়গা–এরাই বা কারা। ফুল্লরার

গলার নীলমনি হার যখন নীরুসিং হাতে তুলে দেখছিলো তখন তার ভীষণ ভয় হচ্ছিলো।

মালোয়া বললো–হুজুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না। এ নীল মনি আপনিই পাবেন। আমি আপনার জন্যই এনেছি এ সওগাত।

সওগাত! হাঃ হাঃ হাঃ সওগাতই বটে। তারপর মালোয়াকে লক্ষ্য করে বললো–মালোয়া, শুধু নীলমনিই নয়, তুমি এমন এক সওগাত এনেছে যার কোনো তুলনা হয় না। অপূর্ব.....ফুল্লরা চিবুকটা উঁচু করে ধরে বলে–অপূর্ব এক সওগাত। জানো মালোয়া, এ রত্ন যত বড় হবে তত মূল্য বাড়বে। যাও, ওকে আড়াখানার বাঈজী জরিনা বিবির কাছে মজুত রেখে দাও, কিন্তু ঐ নীলমনি হার....

ওটা আপনার কাছেই থাক! বললো মালোয়া।

নীরুসিং যেমনি ফুল্লরার গলা থেকে হারছড়া খুলে নেবার জন্য হাত বাড়ালো, অমনি ফুল্লরা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো–না না, এ হার আমি দেবো না, এ হার আমি দেবো না।

মালোয়া বললো–এখন পাক হুজুর। ও হার ওর গলা থেকে খুলে নিলে হয়তো কেঁদে কেঁদে মারা যাবে।

হাঁ, ঠিকই বলেছো মালোয়া, নীলমনি হারের চেয়ে মূল্যবান সম্পদ হবে তোমার ঐ সওগাত। যাও, আমার আদেশ, ও নীল মনির হার কেউ যেন ওর গলা থেকে খুলে না নেয়, যাও সবাইকে সাবধান করে দিও এ ব্যাপারে।

মালোয়া ফুল্লরাকে কোলে নিয়ে আড্ডাখানার ভিতরে চলে যায়, যেখানে জরিনা বিবি বসে বসে পান চিবুচ্ছিলো। জরিনার এখন বয়স হয়েছে, তাই সে নতুন মেয়েদের নিয়ে নাচগান শেখায়। এককালে সেও নাচগান করতো, নীরুসিংয়ের দল তাকে নিয়ে শহরে যেতে, নাচতে জরিনা–ভিড় জমে উঠলো চারপাশে। তখন নীরুসিংয়ের লোকেরা কারও পকেট মারতে কিংবা সোনাদানার মালা থাকলে কেটে নিতোএমনি করে চুরি ডাকাতি করতো। অনেক সময় জরিনা নিজেও পকেট মারতো।

একবার এক পুলিশ সুপারের বাংলোয় নাচ দেখাতে গিয়ে পুলিশ সুপারের পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে নিয়েছিলো সে, তবু পুলিশ সুপার তাকে পাকড়াও

করতে পারেন নি। এহেন জরিনা আজ প্রৌঢ়া তবু তার শয়তানি কমেনি। মাঝে মাঝে সে শহরে যায় এবং কৌশলে ধনীর দুলালী সুন্দরী কন্যা দেখলে তাকে চুরি করে আনে। শুধু কি চুরি করে আনে, তাকে এনে পোষ মানিয়ে নাচগান শেখায়।

নীরুসিং নরপশু, তার আড্ডাখানায় তাই নারীর অভাব নেই।

ফুল্লরাকে এনে যখন মালোয়া জরিনা বিবির হাতে দিলো তখন তার আনন্দ ধরে না–খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো যেন, ফুল্লরাকে দেখে নয়, ওর গলায় নীলমনি হার দেখে।

নীলমনি হার থেকে একটা উজ্জ্বল আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ছিলো চারদিকে।

ভীষণ লোভ হলো জরিনার। সে বললো–মালো, ভাল আছিস তুই?

হাঁ আছি।

কোথায় ছিলি এতদিন?

দস্যু বনহুরের দলে ছিলাম।

একে তুই কোথায় পেলি রে মালো?

পেলাম বনহুরের আস্তানায়।

বনহুর!

হাঁ, বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর, যার অসাধ্য কিছু নেই

তুই তার আস্তানা থেকে একে চুরি করে এনেছিস–এত বড় সাহস তোর হলো।

সাহস এনে দিয়েছে ঐ হারছড়া। জানিস জারিনা, ঐ নীলমনি হার সাত রাজার ধন।

জানি, জানি, তা ঐ হার আমাকে দিবি?

ও হার ওর গলাতেই থাকবে, কারণ সর্দার বলেছে হার যত মূল্যবান তার চেয়েও মূল্যবান হলো ফুল্লরা।

কি বললি মালো, এর নাম ফুল্লরা?

হাঁ। তবে নাম পাল্টাতে হবে। কথাটা বলে মালোয়া ফুল্লরাকে একটা উঁচু চৌকিতে বসিয়ে দেয়।

জরিনা পান চিবুতে চিবুতে আদর করে বলে–ওর নাম আমি মুন্নি রাখলাম।

মুন্নি!

হাঁ।

বেশ, তাই ভাল।

দেখিস মুন্নিকে আমি ভাল নাচ শেখানো। দেখনা ওর মুখখানা কত সুন্দর!

তা তো দেখেছি জরিনা বিবি, আর সেজন্যই তো দুটোই এনেছি একটা মাল না এনে……

ফুল্লরা অসহায় চোখে তাকাচ্ছে জরিনা বিবির দিকে। ভাবছে সে যদি তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যায় তাহলে কত ভাল হয়। মালোয়া হারামি, তাই তাকে পাকড়াও করে এনেছে। একবার যদি সে আস্তানায় যেতে পারতো তাহলে সব কথা সে সর্দারকে বলতো। এ নীল মনি হার সর্দার তাকে দিয়েছে। যদি সর্দার জানতে পারে মালোয়া তার হার চুরি করার জন্য তাকে চুরি করে এনেছে, তাহলে মালোয়াকে উচিত শিক্ষা দেবে সে। কিন্তু কে তাকে নিয়ে যাবে তার আস্তানায়। মালোয়া বড় মিথ্যা বাদী, জাভেদের কাছে নিয়ে যাবার ছলনা করে তাকে নিয়ে এসেছে এক আড্ডাখানায়।

ফুল্লরাকে ভাবতে দেখে আদর করে বলে জরিনা বিবি–কি ভাবছো মুন্নি?

না, আমি মুন্নি নই, আমার নাম ফুল্লরা।

এখানে তোমাকে আমরা মুন্নি বলেই ডাকবো।

ফুল্লরা কাঁদতে থাকে, কোনো কথা বলে না সে।

মালোয়া বলে–জরিনা বিবি, ওকে খেতে দাও, কাল থেকে ওর খাওয়া হয়নি।

জরিনা বিবি একজনকে হুকুম করে–এই, খাবার নিয়ে আয়।

বেরিয়ে যায় লোকটা।

একটু পরে ফিরে আসে, হাতে খাবারের থালা।

জরিনা ওর হাত খাবারের থালা নিয়ে ফুল্লরার সম্মুখে রেখে আদরভরা গলায় বলে–খেয়ে নাও মুন্নি, আমি তোমার মা। এখন থেকে আমাকে মা বলে ডাকবে।

মালোয়া হেসে বলে–হাঁ, তাই ডাকবি ফুল্লরা। জরিনা বিবি এখন থেকে তোর মা।

ফুল্লরা চোখ রগড়ে রগড়ে কাঁদতে লাগলো।

*

বনহুর নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলো। নূরী হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর চুলে। বললো বনহুর আমাকে ফাংহায় যেতে হবে, কারণ আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে রহমান।

নূরী বললো–ফাংহার কাজ তোমার শেষ হবে না? কি এমন কাজ বাকি রেখে এসেছে যে তোমার না গেলেই নয়?

যেতেই হবে আমাকে, কারণ ফাংহায় খোন্দকার বাড়ি নামে এক বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে লুকানন আছে এক গভীর রহস্য। নূরী, সেই রহস্য আমাকে উদঘাটন করতেই হবে। যেতে হবে আমাকে।

কিন্তু ফাংহায় যাওয়ার পূর্বে চৌধুরীবাড়ি যাবে না।

হুঁ, যাবো তবে সেখানে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে কান্দাই পুলিশ বাহিনী।

শুনেছি মিঃ জাফরী এখন তোমার বন্ধু?

হাঁ, নূরী, তিনি আমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কান্দাই সরকার তো আমাকে ভাল চোখে দেখেন না। কান্দই সরকার এখনও আমার মাথার মূল্য দু' লক্ষ টাকাই রেখেছেন। মাঝে মাঝে লোভ হয় নিজেই গিয়ে মাথাটা দিয়ে আসি দু লক্ষ টাকার বিনিময়ে।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠে নূরীলোকে বলে তোমার নাকি লোভ মোহ নেই কিন্তু আমি দেখছি তোমার মত লোভী কেউ নেই, যে নিজের মাথা বিকিয়ে অর্থ পেতে চায়।

তোমার কথা মিথ্যা নয় নূরী, সত্যি অর্থের মোহ বড় মোহ, যা কাউকে রেহাই দেয় না। ইচ্ছা করলে তুমি নিজেও এ কাজ করতে পারো।

যাও, তোমার সঙ্গে আর কথাই বলবো না। তুমি কি মনে করো আমি অর্থলোভী?

রাগ করো না নূরী, যা সত্য তাই বললাম। তাই বলে তুমি কি আমার মাথাটা বিক্রি করে মূল্য নিতে পারবে?

তোমার কথাগুলো বড় হেঁয়ালিপূর্ণ।

হেঁয়ালিতেই ভরা এই বিচিত্রময় পৃথিবী–এর প্রতিটি মানুষ বৈচিত্রময়। নূরী, মাঝে মাঝে মনে হয় দস্যুতা ত্যাগ করে....

সন্ন্যাসী হয়ে যাও, এই তো?

কতকটা তাই। বড় সাধ হয় মনির সঙ্গে দেখা করি কিন্তু কত বাধা তাতে। আজকাল পুলিশবাহিনী কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছেন চৌধুরীবাড়ির চারপাশে।

তাই তুমি যাওনা?

সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয়।

তাহলে তুমি চৌধুরীবাড়ি আর যাবে না?

না গিয়ে উপায় আছে? জানো তো মনিরার অভিমান কত, কিছুতেই তাকে সামলানো যায় না। নূরী, আজও সে জানে না তোমার আসল পরিচয়।

বললো নূরী–সে তোমার অপরাধ। তুমি যদি তাকে না জানাও তাহলে সে জানবে কি করে?

তাকে বহুদিন জানাতে চেয়েছি কিন্তু.......

সাহস পাওনি, এই তো?

যা মনে করো তাই।

বনহুর আর নূরী মিলে যখন আলাপ–আলোচনা চলছিলো তখন বাইরে নাসরিনের কান্নাজড়িত কণ্ঠ শোনা যায়।

নরী চমকে উঠে বলে–নাসরিন কাঁদছে কেন?

বনহুর সোজা হয়ে বসে বললো–তাই তো, এটা নাসরিনের গলা মনে হচ্ছে। কি হয়েছে দেখো তো নূরী?

নূরী বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে একটু পরে নাসরিন এবং কায়েস সহ ফিরে আসে।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে নাসরিন–সর্দার, ফুল্লরাকে আস্তানায় কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, বললো–ফুল্লরাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বলো কি?

কায়েস বললো এবারহাঁ সর্দার। সমস্ত আস্তানায় তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও ফুল্লরা নেই।

বনহুর বললো–ওর গলায় নীলমনি হারছড়া ছিলো বুঝি?

নাসরিন বললো–হা সর্দার, ও হার ফুল্লরা কিছুতেই গলা থেকে খুলে রাখেনি বা রাখতে দেয়নি।

বনহুরের ললাটে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তারেখা, একটু ভেবে নিয়ে বললো সে– আস্তানার বাইরে যায়নি তো

কায়েস বললো–সর্দার, আস্তানার বাইরেও অনেক সন্ধান করা হয়েছে, তাকে বনাঞ্চলে খুঁজেও পাওয়া যায়নি। অনেক খোঁজাখুজি করার পর আপনার কাছে আবার এসেছি সর্দার। একটু থেমে বললো কায়েস–মালোয়াকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

কি বললে?

সর্দার, মালোয়াকেও পাওয়া যাচ্ছে না আস্তানার কোথাও।

হু! অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠলো বনহুর।

নাসরিন কাঁদতে কাঁদতে বললোসর্দার, আমার ফুল্লরাকে এনে দিন। আমার ফুল্লরাকে এনে দিন। নাহলে আমি বাঁচবো না।

বনহুর তাকালো নাসরিনের দিকে, নাসরিনের অবস্থা শোচনীয়, কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটো ফুলে গেছে।

বনহুর বললো…কায়েস, কতক্ষণ হলো ফুল্লরা নেই?

সকাল থেকে।

আর তোমরা এসেছো সন্ধ্যায় আমাকে জানাতে।

ভেবেছিলাম আস্তানার বাইরে কোথাও গেছে। আমরা সবাই তাকে খোঁজাখুঁজি করেছি সমস্ত দিন

শুধু কি মালোয়া আর ফুলুরাই নিখোঁজ, তার সঙ্গে অন্য কিছু নিখোঁজ হয়নি? অশ্বশালায় ভালভাবে খোঁজ নিয়েছে?

সেটা তো ভাবিনি।

যাও দেখে এসো।

কায়েস চলে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো–সর্দার, একটা অশ্ব নেই।

হাঁ, আমি যা ভেবেছি তাই, মালোয়া ফুল্লরাকে চুরি করে নিয়ে ভেগেছে!

সর্দার, মালোয়াকে আমিই এনেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম তাকে। আমার কথাতেই আপনি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের অনুচরদের মধ্যে। আমিই অপরাধী সর্দার।

বনহুর কোনো কথা বললো না, কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো বনহুর....তাজকে প্রস্তুক করে নাও কায়েস।

আচ্ছা সর্দার। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায় কায়েস।

নূরী আঁচল দিয়ে নাসরিনের চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে–ভাবিসনা নাসরিন, নিশ্চয়ই হুর ফুল্লরাকে খুঁজে পাবে।

*

বনহুর ফিরে এলো রাত ভোর এবার কিছু পূর্বে। সন্ধ্যায় সে তাজকে নিয়ে ফুল্লরার সন্ধানে গিয়েছিলো সমস্ত রাত কোথায় ছিলো, কোথায় কত জায়গায় সন্ধান করে ফিরেছে তা সেই জানে। বনহুর যখন তাজকে নিয়ে ফিরে এলো তখন নূরী আর নাসরিন ছুটে এলো বনহুরের মত।

নাসরিন কেঁদে উঠলো বনহুরকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে দেখে।

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো...কোথায় আমাদের ফুল্লরা? হুর, ফুল্লরাকে তাহলে পাওনি?

না পাইনি!

তাহলে উপায়? বললো নূরী।

নাসরিন ডুকরে কেঁদে উঠলো।

বনহুর বললো–ভেবো না নাসরিন, ফুল্লরাকে আমি খুঁজে বের করবোই।

সর্দার! নাসরিন ছুটে এসে বনহুরের পা দু'খানা চেপে ধরে সর্দার, আপনি আমার ফুল্লরাকে এনে দিন।

উঠো নাসরিন, ধৈর্য ধরো, এমনভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না।

নাসরিন উঠে দাঁড়ায়।

তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুবন্যা গড়িয়ে পড়ে।

নূরী ওকে সান্ত্বনা দেয়।

এখানে যখন বনহুরের আস্তানায় ফুল্লরার সন্ধান নিয়ে ভীষণ অবস্থা ফুল্লরাও নীরুসিংয়ের আস্তানায় কেঁদেকেটে অস্থির। তাকে নানাভাবে ওরা প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে চলেছে।

বিশেষ করে জরিনাই ফুলুরাকে আয়েত্তে আনার চেষ্টা করছে নীরুসিং তাকে বলেছে...এই মেয়েটা বড় হলে নীলমনি হারের চেয়ে বেশি মূল্যবান সওগাত হবে। তখন নীলমনি হার হতে তোমার আর ঐ সওগাত হবে আমার।

নীরুসিংয়ের কথাটা জরিনার মনকে আশ্বস্ত করেছে, তাই সে নীলমনি হারের লোভে ফুল্লরার প্রতি যত্নবান হয়েছে। যেমন করে হোক তাকে পোষ মানাতে হবে। বড় করতে হবে, যাতে ফুল্লরা সত্যিকারের সওগাতে পূর্ণ হয়।

মালোয়ার লাভ তাকে হাজার হাজার টাকা দিয়েছে নীরুসিং। যখনই মালোয়া টাকা চায় তখনই তাকে প্রচুর অর্থ দেয়, তাকে কোনো কাজ করতে হয় না। নীরুসিংয়ের আস্তানায় তার খুব কদর।

মালোয়া তাই সব সময় জরিনার পাশে থাকে। জরিনার লোতে নয়, জরিনার দাসীদের লোতে সে ঘুর ঘুর করে বিড়ালের মত। সুযোগ পেলেই ওদের নিয়ে মেতে উঠে আনন্দ ফুর্তিতে।

মালোয়া বনহুরের আস্তানায় এ ধরনের আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হতো না, তাই সে মনে মনে ক্ষুদ্ধ থাকতো। ঐ যে কথায় বলে, যার যা অভ্যাস তা মরণেরও নাকি পাল্টায় না। মালোয়া বনহুরের আস্তানায় দীর্ঘদিন অবস্থান করেও চরিত্র পাল্টাতে পারেনি।

তাই তো মালোয়া পেরেছে ফুলরাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে। শয়তান কোনদিন সৎসংস্পর্শে সাধু হয় না বা হতে পারে না, এটা তারই প্রমাণ।

পরপর কয়েকদিন বনহুর সন্ধ্যার করে ফিরলো ফুল্লরার, কিন্তু কোনো খোঁজ পেলো না।

শুধু বনহুর নয়, বনহুরের অনুচরগণ সবাই ফুল্লরার সন্ধান কান্দাই বনজঙ্গল এবং নগর চষে ফিরলো কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলো না।

নাসরিন কেঁদে কেঁদে সারা হলো। কেউ তাকে প্রবোধ দিতে পারছে না।

নূরীও ওকে স্নেহ করতো, তারও বুক জমাট কান্নায় ভরে উঠলো, মুষড়ে পরলো সেও।

*

রহমান ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন সর্দার এতদিনও আসছে না কে জানে এদিকে খোন্দকার বাড়ির অবস্থা। সংগীন হয়ে কিংবা চাকর বাকরের মধ্যে কেউ না কেউ উধাও হচ্ছে।

খোন্দকার বাড়ির অশান্তি ভীষণ বেড়ে গেছে। ও বাড়িতে কারও মনে সুখ নেই, শান্তি নেই।

ফাংহা পুলিশ অফিসারগণ নানা সন্ধান চালিয়েও এ হদিস খুঁজে পাচ্ছে না। গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয়েছে এ বাড়ির পিছনে।

খোন্দকার বাড়ির অশান্তির ছোঁয়া মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তোলে রীনার বাড়িখানাকে।

রহমান রীনার কক্ষের পাশের কক্ষে ঘুমায় তবু আতঙ্ক রীনার। না জানি কখন কোনো বিপদ হানা দেবে কে জানে!

কদিন হলো ফিরে এসেছে ভুলু তাই কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে রীনা। ভূল ফিরে আসবে ভাবতেই পারেনি রীণা এবং রহমান। কারণ সেই যে সে উধাও হয়েছিলো তারপর আর তার খোঁজ ছিলো না। ভুল যেদিন পুনরায় পুটলি বগলে এসে দাঁড়ালো সেদিন রীনার আনন্দ যেন ধরে না। রহমানকে ডেকে বললো রীনা রহমান সাহেব, দেখুন আপনি যা ভেবেছিলেন তা নয়। ভুল আবার এসেছে।

রহমান একটু লজ্জিত হলো, কারণ সে বাজি রেখে বলেছিলো, মিস রীনা দেখবেন ভুলু আর আসবে না। সে নিশ্চয়ই কোনো কুমতলব নিয়ে এসেছিলো, কাজ সমাধা করে চলে গেছে।

রহমান হেসে বললো–যাক, আপনিই জিতে গেলেন মিস রীনা।

ভুলুকে নিয়ে রহমান আর রীনার মধ্যে এমনি কত কথা হয়েছে তার এবার সমাধান হলো।

ভুলুর কাজ বেশি নয়, তবে কঠিন, সমস্ত দিন ভুলু ঘুমোবে আর রাতে সে জেগে জেগে পাহারা দেবে। তবে কোনো কোনো সময় ভুলু রীনার পাশে বসে গল্প শোনে এই যা।

ভুলুর ব্যবহার ছিলো সুন্দর তাই রীনা ছাড়াও সবাই ওকে ভালবাসতো।

কখন কোন ফাঁকে ভুলু খোন্দকার বাড়ির চাকর রবিউল্লার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

রবিউল্লা পুরোন চাকর, খোকার বাড়িতে সে প্রায় তিরিশ বছর হলো কাজ করছে। চুল পেকে গেছে, দাড়ি পেকে গেছে, শরীর বাঁকা হয়ে এসেছে–বড় বিশ্বাসী চাকর রবিউল্লা। বৌ–ছেলে–মেয়ে ওর কেউ নেই ত্রিভুবনে। খোন্দকার বাড়ির ছেলেমেয়েই রবিউল্লার সন্তান। বড় ভালবাসে রবিউল্লা সবাইকে।

তবে রবিউল্লার একটা নেশা ছিলো, মাঝে মাঝে গাঁজা খাওয়া। ভুলুরও ছিলো ঐ একই নেশা, তাই ভাবটা জমে উঠেছিলো সকলের অলক্ষ্যে, দু'জনের মধ্যে।

ভুলুকে কোনো সময় না পাওয়া গেলে তার সন্ধান মিলতে খোন্দকার বাড়িতে, তবে অন্দরমহলে নয়, রবিউল্লার ঘরে।

দুজন বসে গাঁজার দম দিতে আর রাজ্যের গল্প জুড়ে দিতো। ভুলু ওর জীবনকাহিনী বলতো রবিউল্লাকে আর রবিউল্লা বলতো ভুলুকে।

রবিউল্লা খোন্দকার বাড়িতে যখন এসেছিলো তখন তার বয়স বিশ বছরের কম ছিলো। আর আজ তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিংবা কিছু বেশি অথবা কম হবে। এ বাড়ির সবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার জীবন।

গভীর রাতে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো রীনা।

পাশের কক্ষ থেকে ছুটে এলো রহমান, ব্যস্তসমস্ত হয়ে রীনার কক্ষে প্রবেশ করে বললো কি হয়েছে মিস রীনা?

রীনা তখন ওদিকের জানালার দিকে তাকিয়ে ঠকঠক্ করে কাঁপছিলো।

রহমানকে দেখে সে ছুটে এসে জাপটে ধরলো তার জামার আস্তিন।

রহমান বললো–কি হলো মিস রীনা? ওদিকে তাকিয়ে কি দেখছেন বারবার।

ছায়ামূর্তি! একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলো জানালার পাশে। কেমন যেন ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছিলো তার নিঃশ্বাসের। রহমান সাহেব, আমাকে ছেড়ে আপনি যাবেন না। আমার বড় ভয় করছে।

রহমান বললো–আমি দেখে আসি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

না, আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না।

ঠিক ঐ সময় ভুলু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ায়, বলে সে–আপামনি, আপনার জানালার পাশে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়ায়ে ছিলো। যেমন সে আমাকে দেখেছে অমনি দিয়েছে বোচা দৌড়! ভাগ্যিস আমার হাতে লাঠি ছিলো না, নইলে আমি তাকে দেখিয়ে দিতাম……

রহমান বললো–তুলু, লাঠি ছাড়া তুমি পাহারায় থাকো কেন?

সাহেব, ঐ তো আমার ভুল, সাধে কি আর মা আমাকে না না, বাবা আমাকে ভুলু বলে ডাকতো!

শোনো ভুলু।

জানি সাহেব আপনি আমাকে সাবধান করে দিচ্ছেন। এমন ভুল যেন আর না হয়।

হাঁ, তাহলে চাকরি যাবে তোমার, বুঝলে? আর শোনো, সব সময় বিশেষ করে রাতের বেলায় রীনার ঘরের আশেপাশেই থাকবে।

তা আর বলতে হবে না সাহেব, আমি কোনো সময় আপামনির ঘরের আশপাশ ছাড়া কোথাও যাই না। সব সময় নজর রাখি, কখন কোন্ বিপদ কোন্ পথে আপামনির ঘরে প্রবেশ করে কে জানে। আপামনিই যে এ বাড়িতে আমার একমাত্র ভরসাস্থল।

যাও ভুলু, বাড়ির আশেপাশে ভাল করে লক্ষ্য রাখবে, যেন ঐ ছায়ামূর্তি পুনরায় প্রবেশ করতে না পারে।

রীনা কম্পিত গলায় বলে–ভুলু, ভাল করে খেয়াল রাখিস, আমার বড্ড ভয় করছে। রহমান সাহেব, আপনি এ ঘরেই বসুন।

রহমান বললো–আচ্ছা তাই হবে।

রহমান একটা চেয়ারে বসে পড়লো, কারণ তাকে বাকি রাতটুকু এই চেয়ারেই কাটিয়ে দিতে হবে।

ভুলু বেরিয়ে গেলো বাইরে, এবার সে হাতে একখানা মোটা লাঠি নিতে ভুললো না।

পরদিন ভোরবেলা শোনা গেলো খোন্দকার বাড়ির ঝি হাজেরা খাতুন নিখোঁজ হয়েছে।

রহমান ভীষণভাবে চিন্তিত হলো, আর কতদিন রহমান অপেক্ষা করবে? কেন সর্দার আসছে না বুঝতে পারে না সে!

রীনা বললো–রহমান সাহেব, আমি এ বাড়িতে থাকতে পারবো না আমাকে আপনি অন্য কোনো বাড়িতে নিয়ে চলুন।

রহমান চিন্তিতভাবে বললো–আলম সাহেব না আসা পর্যন্ত এ বাড়িতেই অপেক্ষা করতে হবে মিস রীনা।

কিন্তু পারছি না, খোন্দকার বাড়ির ঝির নিরুদ্দেশটা যেন আমার বাড়ির ছায়ামূর্তির আবির্ভাবের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে।

তা জানি না মিস রীনা, তবে এটুকু বুঝতে পারছি, খোন্দকার বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির একটা গভীর যোগাযোগ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাঁ আমারও তাই মনে হয়।

মিস রীনা আর রহমান যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন ভুলু এসে দাঁড়ায়–আপামনি, খোন্দকার বাড়ি থেকে মেজো খোন্দকার এসেছেন।

মিস রীনা কিছু বলবার পূর্বেই উঠে দাঁড়ালো রহমান এবং বললো–ভুলু তাঁকে বৈঠকখানাঘরে এনে বসতে দাও।

আচ্ছা সাহেব যাচ্ছি। বেরিয়ে যায় ভুল।

রীনা বলে উঠলো–আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে খোন্দকার বাড়ির লোক এ বাড়িতে কেন আসবেন?

হাঁ, তা সত্যি–আমি গিয়ে দেখি কি কারণে কে এসেছেন? রহমান বেরিয়ে যায়।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই রহমান দেখতে পায় বৈঠক খানার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভুলুর সঙ্গে কথা বলছেন খোন্দকার আবদুল্লাহ।

রহমান সালাম জানিয়ে ভিতরে আসতে বললো।

আবদুল্লাহ শান্ত ধীর পদক্ষেপে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন।

তাকে অনুসরণ করে এগুলো রহমান। পিছনে ভুলু।

ভুলু গামছায় চেয়ারগুলো মুছে দিলো তাড়াতাড়ি।

রহমান বললো–বসুন।

আবদুল্লাহ আসন গ্রহণ না করেই বললেন–যিনি সেদিন আপনার সঙ্গে খোন্দকার বাড়ি গিয়েছিলেন তিনি কই? তার সঙ্গে আলাপ আছে।

রহমান মাথা চুলকে বললো–আমার বন্ধু মিঃ আলমের কথা বলছেন বুঝি?

নাম জানি না তবে তিনি নাকি……

হাঁ, সখের গোয়েন্দা বলতে পারেন।

তিনি কোথায়? সেই যে আমাদের বাড়ি থেকে ঢুঁ দিয়ে এলেন আর গেলেন না। আমার বড় ভাই খোন্দকার জামাল সাহেব আজ ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। দিনের পর দিন একটা না একটা বিবাদ আমাদের লেগেই আছে। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন আজ রাতে আমাদের পুরনো ঝি হাজেরা খাতুন উধাও হয়েছে। ভাইজান খুব…

রহমান বললো–বুঝেছি জামাল সাহেব ঘাবড়ে গেছেন।

দেখুন, পর পর এমন দুর্ঘটনা! একটা দীর্ঘশ্বাস খোন্দকার আবদুল্লাহর বুক চিরে বেরিয়ে এলো। তার মুখমন্ডল বড় ম্লান মনে হচ্ছিলো।

রহমান খোন্দকার বাড়িতে সেদিন তাকে দেখেছিলো ক্ষণিকের জন্য। কোনো কথাবার্তা বা আলাপ হয়নি তার সঙ্গে। আজ তাকে ভালভাবে দেখছে এবং তার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাচ্ছে। সত্যি ভদ্রলোককে সেদিন যেমন গম্ভীর সল্পভাষী বলে মনে হয়েছিলো ঠিক তা নয়।

রহমান জিজ্ঞাসা না করতেই তিনি অনেক কথা বললেন–জামাল ভাই সাহেবের ইচ্ছা, কোনো সখের গোয়েন্দা দ্বারা মানে ডিটেকটিভ দ্বারা আমাদের বাড়ির রহস্য উদঘাটন করেন। কারণ, সরকারি গোয়েন্দা এবং পুলিশমহল হিমসিম খেয়ে গেছে, তারা এর কোনো সমাধান আজও করতে পারলো না। জামাল ভাইয়ের ইচ্ছা আমারও ইচ্ছা, তাই এলাম সংবাদ নিতে তিনি কোথায়? আমি তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চাই।

খোন্দকার আবদুল্লার মুখমন্ডল বিষণ্ন মলিন লাগছিলো।

রহমান বললো–আমার বন্ধু মিঃ আলম বিশেষ কোনো কারণে দেখে গেছেন, তবে শিগগিরই ফিরে আসবেন তিনি।

কিন্তু আমরা যে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলাম। আচ্ছা, আপনার নামটা কি জানতে পারি?

বললো রহমান নিশ্চয়ই পারেন। আমার নাম রহমান।

রহমান? শুধু রহমান না আবদুর রহমান না জলিলুর রহমান না হাবিবুর রহমান……

শুধু রহমানই আমার নাম। আপনি রহমান বলেই ডাকবেন।

বেশ, বেশ, তাহলে এখন মিঃ রহমান, উঠি? এলাম মিঃ আলম সাহেবের কাছে বিশেষ প্রয়োজনবোধে কিন্তু ফিরে যেতে হলো।

ভুলু নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিলো, তারপর কখন যে ভুলু ভিতরবাড়ি চলে যায়, গিয়ে আপমনিকে বলে সে আপামনি, বাইরে অতিথি এসেছেন, কিছু নাস্তার আয়োজন করতে হয়।

রীনা তক্ষুণি বাবুর্চিকে ডেকে নাস্তার জন্য বলে দিয়েছিলো। ভুলু নাস্তা নিয়ে হাজির। বললে ভুলু– স্যার, উঠবেন না, একটু নাস্তা করে যান।

রহমান মনে মনে খুশিই হলো, ভুলুকে না বলতেই সে নাস্তার আয়োজন করে একেবারে নিয়ে হাজির হয়েছে। ভুলুর হাত থেকে রহমান নাস্তার প্লেটটা নিয়ে নামিয়ে রাখলো খোন্দকার সাহেবের সম্মুখে কিছু মুখে দিন।

খোন্দকার আবদুল্লাহ বললেন–এসবের কি প্রয়োজন ছিলো! এই তো পাশাপাশি বাড়ি, কতআসবো যাবো……কথাগুলো বলার ফাঁকে নাস্তা খেতে শুরু করলেন খোন্দকার সাহেব।

রহমানের বেশ লাগলো আবদুল্লাহ সাহেবের ব্যবহার। খেতে খেতে বললেন আবদুল্লাহ–আপনারা সেদিন গেলেন কিছু মুখে না দিয়েই চলে এলেন, আর আজ আমি খাচ্ছিনা।

তার সরল–সহজ কথাগুলো ভাল লাগছে রহমানের কাছে। বললো রহমান– বন্ধু এলেই তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার ওখানে যাবো।

খোন্দকার সাহেব নাস্তা করা শেষ করে রুমালে মুখ মুছলেন, তারপর বললেন– আমাদের বিবাদ সম্বন্ধে স্মরণ রাখবেন, কিছু করতে পারেন কিনা।

রহমান বললো–নিশ্চয়ই স্মরণ থাকবে।

খোন্দকার সাহেব বিদায় মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে রহমানের করমর্দন করলেন।

ভুলু সালাম জানিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

খোন্দকার সাহেব ছড়ি হাতে ধীর পদক্ষেপে চলে গেলেন নিজ বাড়ির দিকে।

ভুল নাস্তার প্লেটগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলো, হঠাৎ তার নজরে পড়লো খোন্দকার সাহেব রুমালখানা ভুল করে চেয়ারের হাতলে রেখে গেছেন। ভুলু রুমালখানা তুলে নিয়ে টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রাখলো, সময় পেলে সে একসময় দিয়ে আসবে।

কিন্তু রুমালখানার কথা ভুলু সম্পূর্ণ ভুলে গেলো, আর সে ফেরত দিয়ে এলো না সেটা।

খোন্দকার সাহেব অবশ্য পরে পকেট হাতড়ে খুঁজেছিলেন রুমালখানা কিন্তু পায়নি। কোথায় ছেড়েছেন তাও খেয়াল করতে পারেন নি। নতুন আর একখানা নিয়েছিলেন পকেটে।

সেদিন ভুলু রবিউল্লার ঘরে বসে গাঁজায় দম দিচ্ছিলো। রাত তখন একটা কিংবা দুটো হবে। বেশি রাত না হলে তো আর রবিউল্লা ছুটি পায় না, তাই একটু রাত করেই আসে ভুলু এ বাড়িতে।

ভুলুও কি সহজে আসতে পারে। রহমান সাহেব আর রীনা আপার দৃষ্টি এড়িয়ে অতি সাবধানে তাকে রবিউল্লার ঘরে আসতে হয়। ফটকের পাহারাদার আজকাল পাহারায় থাকে না, কারণ পর পর ক'জন পাহারাদার নিখোঁজ হবার পর সবার মনেই আতংক, কাজেই ফটক আজকাল শুধু বন্ধ যাকে, পাহারাদার থাকে না। রবিউল্লাহ ফটক খুলে দেয় এবং বন্ধ করে।

তাই অনেক রাতে এলেন ভুলু বাধা পায় না, কারণ রবিউল্লার জানা আছে কখন আসবে ভুলু।

গাঁজাটা অবশ্য ভুলুই বোজ কিনে আনে। তাই রবিউল্লার আনন্দ ধরে না, ভুলুকে সে খাতির করে কৌশলে গাঁজার পয়সা জোগাড় করতে হয়। বোজ পয়সা

সে পাবে কোথায়, মাস গেলে মাইনে পায় আশি টাকা। বাড়িতে পাঠাতে হলে কিছু থাকতো না ওর। কিন্তু ভুলুর তো কোনো বাড়িঘর নেই, তাই আশি টাকা পকেটেই থাকে এবং মাসের পনের দিন যেতে না যেতে সব গাঁজার পিছনে উবে যায়। পনেরো দিন রীনা আপনার মুখোপেক্ষী হয়ে তাকে কাটাতে হয়। গাঁজার পয়সার দরকার হলে ভুলু এসে দাঁড়ায় রীনা আপামনির পাশে। কাঁধের পয়সার দরকার হলে ভুলু এসে দাঁড়ায় রীনা আপামনির পাশে। কাঁধের গামছা দিয়ে এটাসেটা ঝাড়পুছ করতে থাকে, তখন রীনা বুঝতে পারে কিছু বলবে ভুল। রীনা তাই জিজ্ঞাসা করে–হ্যাঁ রে ভুলু, কিছু বলবি?

ভুলুর মুখখানা বেশ খুশি খুশি দেখায় তখন, বলে সে–কয়টা পয়সা লাগতো আপামনি!

পয়সা লাগবে তা বললেই পারিস। কত লাগবে বল তো?

কি আর বলবো, যা আপনার খুশি দিন।

রীনার পাশেই থাকে তার হাতব্যাগটা। রীনা যদি একটু খোঁজাখুঁজি করে তাহলে ভুলুই ওটা দেখিয়ে দেয়–এই যে আপামনি আপনার ব্যাগ।

রীনা ব্যাগ খুলে বের করে দেয় কোনোদিন এক টাকা কিংবা দেড় টাকা। বলে–চলবে তো?

আনন্দে ডগমগ হয়ে বলে ভুলুচলবে, চলবে আপামনি!

কি করবি টাকা দিয়ে? নেশা–টেশা করিস নাকি?

কান ধরে দাঁতে জিভ কেটে বলে ভুলু–আরে ছিঃ ছিঃ, নেশা করবো আমি! কি যে বলেন আপামনি। এসব বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

কিন্তু ফাঁক পেলেই বেরিয়ে এসে ভুলু হাজির হবে গাঁজার দোকানে। এদিক–ওদিক দেখে নিয়ে পকেট থেকে বের করবে পয়সা, তারপর গাঁজা কিনে নিয়ে পৌঁছে যাবে বাসায়। তারপর রাতের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতো। কখন ঘুমাবে সবাই তখন সে হাজির হবে খোন্দকার বাড়িতে রবিউল্লার ঘরে।

রবিউল্লা তেমনি সারাটা দিন অক্লান্তভাবে কাজ করতো গতর খাঁটিয়ে, রাতের কথা মনে মনে স্মরণ করে বুড়ো দেহেও তাজা রক্তের বান ডাকতো ওর।

আজ রবিউল্লা আর ভুলু মিয়া যখন রবিউল্লার ছোট ঘরটার মধ্যে কেরোসিন তেলের ডিবেটার পাশে বসে বসে গাঁজা টানছিলো, তখন খোন্দকার বাড়ির মধ্যে শোনা যায় কান্নার শব্দ। কেউ যেন ডুকরে কাঁদছে।

কান্নার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধুপধাপ মারপিটের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে কান্না থেমে গেলো কিন্তু একেবারে চুপ হলো না। চাপা কান্নার আওয়াজ আসছে।

রবিউল্লা গাঁজার কলকে হাতের মুঠায় চেপে ধরে গাঁজা টানছিলো, সে কলকেটা ভুলুর হাতে দিয়ে বললো–নাও, তুমি খাও।

ভুল বললো–এত তাড়াতাড়ি খাওয়া হলো?

রবিউল্লা বললো–ভাল লাগছে না নেশা করা। বেচারী সেজো সাহেবকে মারছে। জানিস ভুলু, ওকে আমার খুব ভাল লাগে। আমিই তো সেজো ছোট এদের কোলেকাখে করে মানুষ করেছি। আজ সেজো পাগল, তুই ওকে সবাই ধরে মারে। প্রাণ খুলে একটু কাঁদবে তাও পারে।

ভুলুর কানে রবিউল্লার কথাগুলো যাচ্ছে কিনা বোঝা গেলো না, সে তখন গাঁজার নেশায় মত্ত।

রবিউল্লা বলেই চলেছে–সেজো সাহেবকে তুমি দেখোনি ভুলু, নাম তার খোন্দকার কামাল। ছোটবেলা থেকেই খামখেয়ালী ছিলো, নেশাও করতে মাঝে মাঝে, তবে আমাদের মত কম পয়সার নেশা নয়–দামী দামী বোতল খেতো সে!

ভুলু তখন নেশায় মশগুল, কলকে থেকে অনর্গল ধূয়া নির্গত করে চলেছে। রবিউল্লার কথায় সে তেমন কান দিচ্ছে না, তবু বলেই যাচ্ছে রবিউল্লাহ।

যেদিন বড় সাহেব তার শোবার ঘর থেকে নিখোঁজ হন সেদিন খোন্দকার কামাল সাহেবের সঙ্গেই তো তার কথা কাটাকাটি হয়েছিলো। বড় খোন্দকার নিখোঁজ হবার পর সবেচেয়ে সেই বেশি শোক পেয়েছে—এখন সে পাগল।

ভুলু এবার কলকে হাতে নামিয়ে নিয়ে বলে উঠলো–পাগল! পাগল হলো কেন?

ঐ তো বললাম বড় সাহেবের সঙ্গে তার গন্ডগোল হয়েছিলো আর সেই রাতেই বড় সাহেব নিখোঁজ হলেন, তাই কামাল সাহেব শোকে কাতর হয়ে শেষ পর্যন্ত পাগল হলো……

কিন্তু কাঁদছেন কেন?

যখন বড় সাহেবের কথা তার মনে পড়ে তখন সে ডুকরে কাঁদে, কারণ বড় সাহেবকে সে খুব ভালবাসতো কিনা, তাই।

তবে হঠাৎ কান্না চুপ হলো কেন?

ও, তুমি তো কিছু জানো না! জামাল সাহেব যখন ডুকরে কাঁদে তখন বাড়ির সবার ঘুমের অসুবিধা হয়, তাই মেজো সাহেব তাকে বেদম প্রহার করেন, তখন চুপ হয়ে যায় কামাল সাহেব।

মেজো! মেজো সাহেব কে।

তাকে চেনো না ভুলু, আমাদের খোন্দকার জামাল। তিনি তো মেজো সাহেব।

ও তাই বলো। মেজো সাহেব মানে জামাল সাহেবকে তো বেশ সোজা সহজ মানুষ বলে মনে। তিনি ছোট ভাইয়ের শরীরে হাত তোলেন কি করে, মায়া হয় না পাগল ভাইকে মারতে?

হয় না, আবার খুব হয়। প্রথম প্রথম মারতেন না, শুধু শাসন করতেন কিন্তু কান্না থামতো না তা, তাই আজকাল মারেন। মারলে চুপচাপ কাঁদে শব্দ না করে। বাড়ির কারও ঘুমানোর অসুবিধা হয় না তখন।

ও, তাই বল। ভুলু আবার গাঁজার কলকেতে টান দেয়।

রবিউল্লা বলে উঠে–আজ কিন্তু তুমি বেশি খাচ্ছো।

ভুল কলকেটা ঠোঁট থেকে একটু ফাঁক করে সরিয়ে নিয়ে বললো–কাল তুমি বেশি খেও রবি ভাই।

তুমি তো তখন রাগ করবে না?

রাগ করবো কেন?

তোমার পয়সায় মাল আনো আর খাই আমি তাই লজ্জা করে আমার। সত্যি তোমার পয়সায় শুধু খাই ভুলু ভাই......

তাতে কি আমি কি কোনোদিন তোমাকে বলেছি কিছু যত পারো শুধু খেয়ে যাও। আপামনি আমাকে পয়সা দেন তাই তো তোমাকে খাওয়াতে পারি, নইলে কি খাওয়াতে পারতাম।

তখন বাড়ির মধ্যে পাগল খোন্দকার কামালের কান্নার শব্দ আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

শোনা গেলো খোন্দকার জামালের গলা–ফের যদি শব্দ করে কাঁদবি তবে মেরে হাড় গুড়ো করে দেবো......পরক্ষণেই শব্দ হলো দরজা বন্ধ করার।

রবিউল্লা খুব করে গাঁজা টানতে লাগলো, ঠিক সেই সময় ফটক খোলার শব্দ হলো।

ভুলু রবিউল্লর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললো–কে যেন ফটক খুলে ভিতরে ঢুকছে।

এ্যা, কি বললে ভুলু।

ফটক খোলার শব্দ শোনা গেলো।

তাই নাকি?

হাঁ।

গাঁজার কলকে ভুলুর হাতে ফেরত দিয়ে বললো রবিউল্লা জালিয়ে খেলো ছোট খোন্দকার।

ছোট খোন্দকার সে আবার কে?

ঐ তো সবার হোট ওর নাম খোন্দকার নেহার।

তা এত রাতে ফটকের বাইরে কেন তিনি।

বলবে না তো কারও কাছে?

না না, বলবো না! ভুলুর তখন নেশা জমে উঠেছে ভালভাবে। কথাগুলো তাই সে টেনে টেনে বলছিলো।

রবিউল্লা উঠে দাঁড়িয়ে বলে–যাই, ফটক বন্ধ করে আসি।

বলবে না ছোট খোন্দকার এত রাত পর্যন্ত কেন বাইরে থাকেন।

এসে বলবো। টলতে টলতে বেরিয়ে যায় রবিউল্লা।

সেই ফাঁকে ভুলু গাঁজার কলকে ঢেলে আবার নতুন করে গাঁজা ভরে নেয়। আগুন ধরিয়ে টানতে শুরু করে। অল্প সময়ে নেশায় বুঁদ হয়ে উঠে ভুলু একেবারে।

ততক্ষণে ফিরে আসে রবিউল্লা, টলছে ওর দেহখানা, ঝড়ের বেগে যেমন তালপাতা দোলে তেমনি। ঘরে ঢুকে জড়িত গলায় বলে রবিউল্লা এইবার শেষ বারের মত ফটক বন্ধ করে এলাম…

কেন, সবার আসা বুঝি শেষ হলো? গাঁজার কলকে হাতের মুঠায় চেপে ধরে বললো ভুলুল।

রবিউল্লা হাত বাড়িয়ে কলকে নিলো হাতে, তারপর বললো–নেহাল সাহেব একটু রাত করেই বাসায় ফেরে। বাড়িতে তার তেমন টান নাই কিনা। বৌ ঘরে থাকলেই বাইরে রাত বাড়ানো দেখিয়ে দিতো। হাঁ…….কথাগুলো বলে কলকেতে টান দিতে লাগলো রবিউল্লা।

ভুলু হঠাৎ চমকে বলে উঠলো–সর্বনাশ হয়েছে!

রবিউল্লা বললো কেন?

এতক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে বসে আছি, ওদিকে বুঝি ছায়ামূর্তি ঢুকে পড়েছে আপামনির ঘরে।

ছায়ামূর্তি? সে কি রকম ভুলু।

আমিও তো তাই ভাবি, ছায়ামূর্তি সে কি রকম।

তবে যে তুমি বললে?

আপামনি বলে তাই।

ও, তাহলে তুমি আজও দেখোনি?

না, তবে একটু আধটু দেখেছি–হাঁ, দেখলে এবার নিশ্চয়ই তোমাকে দেখাবো। যাই, আপামনি হয়তো জেগে উঠেছেন। এসো রবিউল্লা, ফটকখানা আর একবার বন্ধ করে এসো।

জালালে ভুলু! আবার আমাকে উঠতে হলো তাহলে।

তুমি, আপনি এসব আমার ভাল লাগে না। তুই বলবি, তা হলে বেশি খুশি হবো। তুমি'টা কেমন যেন পর পর মনে হয়।

আচ্ছা বাবা, এবার থেকে তোকে তুই বলেই ডাকবো। নে খুশি হয়েছিস তো?

খুব–খুব খুশি হয়েছি।

চল্ এবার রেখে আসি।

ভুলু আর রবিউল্লা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। খোন্দকার বাড়ির একপাশে রবিউল্লার ঘর। ঘর থেকে বাইরে বেরুতেই প্রথম নজরে পড়ে উত্তরের পুকুরঘাট।

হঠাৎ রবিউল্লা বলে উঠে–ভূত–ভূত.......

ভুলু বলে–ভূত!

হাঁ পুকুরঘাটে ভূত দাঁড়িয়ে আছে, দেখ দেখ ভুলু?

তাই তো!

ভুলু আর রবিউল্লা ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপা শুরু করে দিয়েছে। ওরা দেখতে পেলো পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি দ্রুত নেমে গেলো

ঘাট বেয়ে নিচে পুকুরের পানির মধ্যে।

ভুলু আর রবিউল্লা তো অবাক!

ছায়ামূর্তি যে অশরীরী তাতে কোনো ভুল নেই, নাহলে কি করে ছায়ামূর্তি পুকুরের অতল গহ্বরে নেমে গেলো।

ভুলু আর রবিউল্লা পা–পা করে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়ালো। সে এক অবাক কান্ড–পুকুরের পানিতে সেকি আলোড়ন চলেছে। পানির ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে তর্জন গর্জন। ছায়ামূর্তি কি তবে জলদৈত্য। যে পানির অতলে সে বাস করে।

ভুলু খুব করে চোখ রগড়ে তাকালো পুকুরের পানির দিকে, তবে কি সে স্বপ্ন দেখছে।

রবিউল্লা বললো–আজ নতুন দেখছি ভুলু মাঝে মাঝে পুকুরের পানি এমনি তোলপাড় হয়। আমরা ভয় করি না জানিস?

আমার কিন্তু বড় ভয় করছে, চল রবিউল্লা আমাকে ফটকের বাইরে রেখে আয়।

চল তাই চল......ওরা দুজন এগুতে থাকে।

*

পুলিশমহলের গোয়েন্দা আহমদ আলী স্বয়ং খোন্দকার বাড়ির এ রহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি কোন ক্লু আবিষ্কারে সক্ষম হন নি।

জামাল সাহেব ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বড় ভাই খোন্দকার খবির সাহেবের নিরুদ্দেশের পর থেকে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, সেদিন থেকে জামাল সাহেব কামালকে ভাল নজরে দেখেন না। তিনি বলেন, পাগলামি তার অভিনয়, বড় ভাই খবির সাহেবকে কামালের চক্রান্তেই সরানো হয়েছে। এমন কি পুলিশকেও তিনি নিজের মনের কথা জানিয়েছেন।

গোয়েন্দা আহমদ আলী তাই মাঝে মাঝে এসে কামালের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করেন, তার উদ্দেশ্য কৌশলে কামালের ভিতরের ব্যাপার জেনে নেওয়া।

খোন্দকার আবদুল্লাহ শান্ত–বুদ্ধিমান, তিনি বড় ভাইয়ের অন্তর্ধানে গভীরভাবে চিন্তিত হলেও একেবারে জামাল সাহেবের মত ভেঙে পড়েননি, তিনি সজাগভাবে সবদিক লক্ষ্য করে চলেছেন। যদিও তিনি নিরিবিলি থাকতে ভালবাসেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর কিবরিয়াকে আবদুল্লাহ সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে চলেছেন। তিনি তাকে বলেছেন যেমন করে থোক খন্দকার বাড়ির এই রহস্য উদঘাটন করতেই হবে। দিন দিন খোন্দকার বাড়ির অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। যে বাড়িতে ছিলো অনাবিল শান্তি সেই বাড়ি এখন ভুতুড়ে বাড়িতে রূপ নিয়েছে।

সেদিন দুপুরে খোন্দকার বাড়ির বৈঠকখানায় ইন্সপেক্টর কিবরিয়া, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আহমদ আলী এবং খোন্দকার আবদুল্লাহ বসে আলাপ–আলোচনা করছিলেন। দু'মাস কোনো নতুন কান্ড ঘটেনি। খোন্দকার বাড়িতে। দু'মাস বেশ নিশ্চিন্ত ছিলো এ বাড়ির সবাই। যদিও শান্তি ছিলো না খোন্দকার খবির সাহবের অন্তর্ধানের পর থেকে। তারপর আরও একটা বড় অশান্তি পাগল কামালকে নিয়ে। সব সময় সে হট্টগলো করতো। গেলো কোথায় সে, যে কি হাজার বকুনি খেলেও বাড়ি ছেড়ে কোথাও সেই হাজেরা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। এ কারণেই খোন্দকার বাড়িতে আবার নতুন আতঙ্কের ছায়া পড়েছে।

পুলিশমহলও তাই আবার হন্তদন্ত হয়ে পড়েছেন খোন্দকার বাড়ি নিয়ে। এত তদন্তের পরও এমন হলো কি করে। আবার সেই লোক হরণ, আবার সেই উকুণ্ঠা।

পুলিশ ইন্সপেক্টর কিবরিয়া এবং গোয়েন্দা প্রধান আহমদ আলী খোন্দকার আবদুল্লাহর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। বললেন আহমদ আলী–কতদিন হলো এ বাড়িতে এ রকম অদ্ভুত কান্ড শুরু হয়েছে সঠিক করে বলতে পারেন কি?

খোন্দকার আবদুল্লাহ শান্তশিষ্ট স্বল্পভাষী মানুষ, তিনি চট করে জবাব দিতে পারলেন না, কিছুক্ষণ মৌন থেকে তারপর বললেন–প্রায় সাত বছর পূর্বে আমাদের বাগানবাড়ির মধ্যে প্রথম অদ্ভুত ভয়াল আলোকরশ্মি দেখা যায়।

আলোকরশ্মি?

হাঁ, অদ্ভুত সে আলোকরশ্মি কেমন যেন লালচে রক্তাক্ত ধরনের। সাধারণত গভীর রাতের এই ভয়াল আলোকরশ্মি দেখা যায়।

কুঁচকে বলেন মিঃ কিবরিয়া–আর পুকুরের পানিতে মাঝে মাঝে নার্কি তর্জন–গর্জন আলোড়ন হয়, এটাও কি আপনারা শুনেছেন না স্বচক্ষে দেখেছেন?

হাঁ শুনেছি, তবে আমি দেখিনি।

আপনাদের বাড়ির আর কে দেখেছে বা শুনেছে এই অদ্ভুত কান্ডখানা?

আমার বড় ভাই খোন্দকার জামাল।

হুঁ তাহলে তাকেও ডাকুন, তার মুখেও শুনতে চাই এ ব্যাপারটা। বললেন আহমদ আলী।

কিবরিয়া সাহেব বললেন–আমরা সবকিছু তার মুখেই শুনেছি এবং জেনেছি। এবার আপনি শুনুন মিঃ আলী।

হাঁ, আমি নিপুণভাবে সব কথা শুনতে চাই। বললেন আলী সাহেব।

খোন্দকার আবদুল্লাহ ডাকলেন–বিউল্লা.......রবিউল্লা.......

আসছি সাহেব! কথাটা বলে বলে দৌড়ে এসে হাজির হলো রবিউল্লা, হাত কচলে বললো সে সাহেব এসেছি।

শোন্ রবিউল্লা, ভাইয়াকে ডেকে আন্।

আচ্ছা আসছি।

চলে যায় রবিউল্লা।

মিঃ আলী বলেন–আপনাদের বিরক্ত করছি, এজন্য আমরা দুঃখিত।

আবদুল্লাহ সাহেব বললেন–না না, মোটেই বিরক্ত হচ্ছি না আমরা, কারণ আপনারা আমাদের বাড়ির শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

কিন্তু শান্তি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করলেন খোন্দকার জামাল সাহেব।

মুখে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি, একটা বিরক্তির ছাপ তার দু'চোখে ফুটে উঠেছে। কক্ষে প্রবেশ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন কারও কিছু বলার অপেক্ষা না করে, তারপর বললেন–শান্তি! এ বাড়িতে কোনোদিন আর শান্তি ফিরে আসবে না, বৃথা আপনাদের চেষ্টা, ইন্সপেক্টার। বলুন কি আপনাদের প্রশ্ন? হাঁ, একটা কথা বলে রাখি বেশি কিছু প্রশ্ন করবেন না, করলে কোনো জবাব পাবেন না। এতদিন তো আপনাদের বহু প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।

না, বেশি বিরক্ত করবে না আপনাকে, কারণ আবদুল্লাহ সাহেবের কাছে আমরা কিছু কিছু জেনে নিতে সক্ষম হয়েছি। কথাগুলো বললেন কিবরিয়া সাহেব।

খোন্দকার জামাল বলে উঠলেন–কিছু কিছু যখন ওর কাছে জেনে নিতে পারলেন তাহলে সবটুকু জেনে নিলেই পারতেন?

না, উনি সবকিছু বলতে পারলেন না, নাহলে উনার কাছেই জেনে নিতাম আমরা। কিবরিয়া সাহেব কথাটা বলে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর তিনি বললেন–ইনি গোয়েন্দা প্রধান মিঃ আহমদ আলী।

হাঁ, আমার সঙ্গে এনার পরিচয় এর পূর্বে হয়েছে। কাজেই নতুন করে আর পরিচয় ব্যাপারে সময় নষ্ট না করে চটপট যা জিজ্ঞাসা করার করুন। গম্ভীর মুখে কথাগুলো বললেন জামাল সাহেব।

কিবরিয়া বললেন মিঃ আলী, আপনিই প্রশ্ন করুন কি জানতে চায়

হাঁ, আমিই বলছি। বলে কথা শুরু করলেন আহমদ আলী–আপনাদের সব কথা যদিও আমার জানা হয়ে গেছে মিঃ জামাল,

তবু আরও জানতে চান, এই তো?

মানে আপনি নাকি নিজের চোখে দেখছেন পুকুরের পানিতে তর্জন গর্জন আর আলোড়ন–এই কথা?

হাঁ।

তাই বলুন, এ কথা জিজ্ঞাসা করবেন তাতে এমন আর কি! আপনারা বসুন, আমি চা–নাস্তা আনতে বলে আসি, তারপর–চা–নাস্তা খেতে খেতে সব শুনবেন।

আবদুল্লাহ সাহেব বললেনভাইয়া, আপনি বসুন, আমি চা–নাস্তার জন্য ভিতরে বলে আসি।

হাঁ, তাই যাও আবদুল্লাহ, তাই যাও।

আবদুল্লাহ সাহেব বেরিয়ে যান।

জামাল সাহেব বলেন–ও বড্ড আপনভোলা, তা ছাড়া ও নিরিবিলি ভালবাসে, এতক্ষণ এখানে বসে থাকাটা ওর কাছে বিরক্তিজনক। চলে গেলো ভাল হলো। এবার যা জানতে চান বলুন?

ঐ যে পুকুরের পানিতে……

ও হাঁ হাঁ, পুকুরের পানিতে তর্জন গর্জন আলোড়ন–সত্যি, ভূতুড়ে ব্যাপার। বললে বিশ্বাস করবেন

নিশ্চয়ই করবো। আর বিশ্বাস না করলে কাজ করবোই বা কি করে। শুনলাম আপনি নাকি ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছেন? কথাগুলো জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ আলী।

খোন্দকার জামাল সাহেব কিছুক্ষণ মৌন হয়ে ভাবলেন তারপর তিনি বললেন–সেদিন ছিলো অমাবস্যা রাত। বাইরে গিয়েছিলাম কোনো কাজে, ফিরতে রাত হলো অনেক। হাঁ, আর একটা কথা বলে রাখি তখন আমার বড় ভাইয়া খোন্দকার খবির নিরুদ্দেশ হননি! তখন বাড়িতে কোনো ভূতুড়ে কান্ড ঘটেনি। খোন্দকার বাড়িতে ছিলো অনাবিল শান্তি।

থামলেন জামাল সাহেব, আনমনে তাকালেন তিনি দরজা দিয়ে বাইরে বাগানবাড়ির দিকে। কিছু ভাবলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন–আব্বা মারা যাবার পর থেকে বড় ভাইয়াই সংসার দেখাশোনা করছিলেন। একটু হেসে বললেন–সব বিস্তারিত না বললে আপনাদের কাজ সহজ হবে না, তাই গোড়া

থেকেই বলছি। সত্যি, আপনারা আমাদের খোন্দকার বাড়ির শান্তি ফিরে আনার জন্য কত চেষ্টা করছেন।

বলে উঠেন মিঃ আলী–এটা আমাদের কর্তব্য খোন্দকার সাহেব। বলুন তারপর?

বলেছি তো কোনো প্রশ্ন করবেন না, যা বলবার আমিই বলে যাবো। জানেন তো আমি সংক্ষেপে কথা বলতে ভালবাসি।

আচ্ছা তাই বলুন। বললেন কিবরিয়া সাহেব।

যদিও পুলিশমহল খোন্দকার বাড়ির রহস্য উদঘাটন ব্যাপারে তদন্ত করতে এসে সবকিছু জেনে নিয়েছিলেন পূর্বেই, তবুও গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের প্রয়োজনে পুনরায় জানার দরকার হয়েছে এবং সে কারণেই ইন্সপেক্টার কিবরিয়া ও মিঃ আলী খোন্দকার জামালকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন।

বলতে শুরু করেন পুনরায় জামাল সাহেব।

ঐ সময় আবদুল্লাহ সাহেব রবিউল্লার হাতে চা-নাস্তার ট্রে নিয়ে হাজির হলেন।

জামাল সাহেব বললেন–তুমি আবার এলে কেন আবদুল্লাহ রবিউল্লাই তো একা আনতে পারতো? যাও তুমি, আমি যখন আছি তখন তোমার কোনো প্রয়োজন হবে না।

আবদুল্লাহ বললেন–আচ্ছা যাচ্ছি।

মিঃ আহমদ আলী ঐ মুহূর্তে মিঃ কিবরিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলেন।

আবদুল্লাহ সাহেব চলে গেলেন না বাইরে অপেক্ষা করছেন দেখবার জন্য জামাল সাহেব একবার উঁকি দিয়ে বাইরেটা দেখে এলেন, তারপর বলতে শুরু করলেন–কাজ সেরে ফিরতে রাত হলো অনেকদারোয়ান ফটকের পাশে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো। আমি দাঁড়াতেই ফটক খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো দারোয়ান।

আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম।

সঙ্গে কেউ ছিলো আপনার? প্রশ্ন করলেন আলী সাহেব।

বলেছি তো আমাকে নতুন করে প্রশ্ন করবেন না, আমি যা জানি না দেখেছি সব খুলে বলবো।

আচ্ছা তাই বলুন।

আমি একাই বাইরে যাই, কারণ আমি সঙ্গী বা সাথী পছন্দ করি না। হাঁ, তারপর কি বলছিলাম, ঠিক মনে পড়েছে–আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে প্রবেশ করে সামনে এগুচ্ছি হঠাৎ আমার কানে ভেসে এলো কেমন যেন একটা শব্দ। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, কান পেতে শুনতে লাগলাম, শব্দটা আমাদের পুকুরপাড়ের দিক থেকেই আসছে বলে মনে হলো। আমি এগুতে লাগলাম এবার পুকুরপাড়ের দিকে। মনে ভয় হচ্ছিলো, কারণ সেদিন ছিলো অমাবস্যা রাত, যদি কোনো ভূতপ্রেত বা জ্বিন হামলা করে বসে.......

জামাল সাহেবের কথায় মৃদু হাসলেন মিঃ কিবরিয়া এবং মিঃ আহমদ আলী।

জামাল সাহেব মনে মনে ক্ষুদ্ধ হলেন, তিনি বললেন–হাসবেন না, আমি যা বলেছি সত্য। ভূত প্রেত আমিও বিশ্বাস করতাম না, এখন করি–মানে সেদিনের পর থেকে করি। পুকুরপাড়ে পৌঁছে যা দেখলাম তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অমাবস্যার অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখলাম সে কি তর্জন গর্জন, পুকুরের পানি। যেন তোলপাড় করছে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। পা দু'খানা যেন মাটিতে বসে গেছে আমার। ফিরে আসবো তাও পারছি না, ভয় হচ্ছে কেউ যদি পিছন থেকে আক্রমণ করে।

হঠাৎ দারোয়ান এসে আমাকে ভয় থেকে উদ্ধার করলো। বললো–সাহেব, কি দেখছেন?

আমি আংগুল দিয়ে দারোয়ানকে পুকুরের পানি দেখিয়ে দিলাম।

দারোয়ান বললো–চলুন সাহেব, অন্তপুরে চলুন। পুকুরে দৈত্য আছে, সে এমনি তোলপাড় করে। আমরা আরও অনেকদিন দেখেছি.......

আমি বললাম বলিস কি, আরও অনেকদিন তোরা দেখেছিস!

হা সাহেব! চলুন, তাড়াতাড়ি ভিতরে যাই। নিশ্চয়ই ভূত কিংবা প্রেত না হয় দৈত্য আছে সাহেব এই পুকুরে। নাহলে পানি এমন করে!

দারোয়ান আর আমি দু'জনে এসে পৌঁছলাম। দেখি বড় ভাইয়া বারান্দায় পায়চারী করছেন, হাতে তার বন্দুক।

আমাকে দেখমাত্র ভাইয়া বললেন–এত রাত কোথায় ছিলে জামাল? বাড়িতে কখন কি ঘটে তার ঠিক নেই।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলাম বড় ভাইয়ার পাশে, দেখলাম তার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে।

আমি পাশে দাঁড়াতেই ভাইয়া বললেন–এটা ছায়ামূর্তি বাড়ির ভিতর থেকে খিড়কি জানালা দিয়ে পুকুরের দিকে চলে গেলো। আমি গুলী ছুঁড়বো এমন সময় দেখি ছায়ামুর্তি অন্ধকারে মিশে গেছে। একটু থেমে বললেন–মনে হলো অশরীরী আত্মার ছায়ামূর্তি……

আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো ভাইয়ার কথায়। আমি পুকুরের পানিতে যে তর্জন গর্জন শুনেছি এবং যে আলোড়ন দেখেছি, তার কথা গোপন করে গেলাম, বুঝতে পারলাম ঐ ছায়ামূর্তির সঙ্গে পুকুরের পানির আলোড়নের যোগাযোগ আছে এবং সব সেই ভূত, প্রেত বা দৈত্যরাজ্যের কাজ কিংবা জ্বিন হবে।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে আমাদের চতুর্থ ভাই কামালের সঙ্গে কোনো ব্যাপার নিয়ে বড় ভাইয়ার বেশ কিছু কথা কাটাকাটি হয়। অবশ্য গন্ডগোলের আসল বিষয় হলো কামাল সংসারের টাকা পয়সা যথেচ্ছাভাবে খরচ করতো এবং ভাইয়ার কাছে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করেই সে সরকারের নিকট থেকে টাকা নিতো……।

এতক্ষণে কথা বললেন মিঃ আহমদ আলী, তিনি বললেন–কামাল কি এ বাড়িতেই থাকতেন বা আছেন?

হাঁ, সে এ বাড়িতেই থাকত এবং আছে। পাঁচ ভাই আমরা–একই বাড়িতে থাকি, একই অন্নে আছি সবাই। কোনো চিন্তা ভাবনা ছিলো না আমাদের কারো মনে কিছু এখন এ বাড়িতে চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই।

বললেন আলী সাহেব–কামালের কি নেশা করার অভ্যাস ছিলো?

হাঁ, এবং সে জন্যই ভাইয়া তাকে গালমন্দ করতেন, তিনি আমাদের সবার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

আচ্ছা, ঐ যে বাগানের অদ্ভুত আলোকরশ্মি সম্বন্ধে...

মিঃ আলীর কথার মাঝখানে বলে উঠেন খোন্দকার জামাল সাহেব–হাঁ, বলতে যখন শুরু করেছি তখন সব বলবো আলোকরশি আরও ভীতিকর ব্যাপার। কোনো কোনো দিন গভীর রাতে একটা নীলাভ আলোর বল মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে আসে বাগানের মধ্যে, তারপর নেচে নেচে বেড়ায়; কিন্তু আরও আশ্চর্য, নীলাভ আলো বল থেকে বেরিয়ে আসে এক ধরনের লালচে আলোকরশ্মি। তখন সমস্ত বাগানবাড়িটা কেমন যেন ভূতুড়ে লাগে। তাই কেউ সাহস করে না সেখানে গিয়ে দেখতে।

এ আলোকরশ্মি কি প্রায়ই দেখা যায়?

না, হঠাৎ কোনো কোনো দিন। একটু থেমে বললেন জামাল সাহেব–যা বলছিলাম সে কথাই আগে শুনুন। যেদিন বড় ভাইয়া কামালের সঙ্গে রাগারাগি করেন, সেইদিন রাতেই বড় ভাইয়া তার শোবার ঘর থেকে উধাও হন।

কি করে আপনারা জানলেন বড় ভাই রাতেই নিখোঁজ বা উধাও হয়েছেন? প্রশ্নটা মিঃ কিবরিয়া করলেন।

জামাল সাহেব রাগ না করেই জবাব দিলেন–ভোরে। আমরা ভোরে দেখলাম তিনি তার শয্যায় নেই। দরজা ভেজানো আছে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি বাগানবাড়িতে গেছেন কিন্তু বাগানবাড়ি বা কোথাও তাকে পাওয়া গেলো না। তবে হাঁ, তার একখানা চটি জুতো পাওয়া গিয়েছিলো পুকুর পাড়ের সিঁড়ির ধাপে।

বলে উঠলেন মিঃ আলী–পুকুরপাড়ে সিঁড়ির ধাপে যে জুতো বা চটি পাওয়া গেছে তা কি আছে?

হাঁ আছে এবং আমরা সেটা যত্ন করে রেখেছি। দেখুন আমরা মনে করেছিলাম তিনি পুকুরে ডুবে মারা গেছেন এবং সে কারণে আমরা জেলেদের ডেকে জাল দিয়ে সমস্ত পুকুরের পানিতে বড় ভাইয়ার মৃতদেহের সন্ধান করি। কিন্তু লাশ পাওয়া যায়নি বা তার কোন জামাকাপড় কিছু পাইনি।

বললেন কিবরিয়া–আশ্চর্য বটে!

জামাল সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন–হাঁ আশ্চর্য বটে, কারণ পুকুরপাড়ের সিঁড়ির ধাপে ভাইয়ার পায়ের জুতো আছে অথচ পানিতে তার চিহ্ন নেই! একটু থেমে বললেন জামাল সাহেব–বড় ভাইয়া যে রাতে নিরুদ্দেশ হলেন সেই রাতে কামালের ঘরে দেখা গেলো কামাল নেই। টেবিলে তার খাবার যেমন তেমনি ঢাকা দেওয়া আছে। অনেক খোঁজাখুজির পর তাকে হোটেল দাস্তানে পাওয়া যায়। নেশা করে সে হোটেল দাস্তানের এক কক্ষে বুদে হয়ে পড়েছিলো।

যখন সে শুনলো বড় ভাইয়া তার বিছানায় নেই, রাতে নিখোঁজ হয়েছে তখন সে প্রথমে হেসে উঠলো আনন্দে, কারণ তাকে গালমন্দ করেছিলেন তাই সে প্রথেমে খুশি হলো কিন্তু পরক্ষণেই কেঁদে উঠলো হাউমাউ করে কারণ বড় ভাইয়া আমাদের সবাইকে পিতার স্নেহে লালন পালন করেছেন। ভালও বাসতেন তিনি খুব, তাই পিতৃসমতুল্য ভাইয়ার নিখোঁজ সংবাদ তাকে ভীষণ ব্যথিত করলো। তারপর থেকে সে পাগল–কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, আর কখনও ভাইয়ার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকে।

তাহলে বড় নিখোঁজ, মেজো আপনি আর আবদুল্লাহ সাহেব সেজো আর কামাল সাহেব পাগল আর ছোট মানে সবার ছোট.....

মিঃ আলীর কথা শেষ না হতেই একটা যুবক শিস দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলো। বৈঠকখানায় লোকজন বসে আলাপ–আলোচনা করছে সেদিকে সে তেমন খেয়াল করেনি।

জামাল সাহেব তাকে লক্ষ্য করে বললেন–নেহাল, শোনো।

নেহাল ফিরে তাকালো, তারপর নতমস্তকে এসে দাঁড়ালো তাদের তিনজনার সম্মুখে, অবশ্য সালামটা সে জানিয়ে নিলো সম্মুখে দাঁড়াবার পূর্বেই।

জামাল সাহেব বললেন–এই হলো সবার ছোট, নাম খোন্দকার নেহাল।

মিঃ আলী এবং মিঃ কিবরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নেহালের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন বয়স হিসেবে চেহারা একটু বেশি ছেলেমানুষ। চোখেমুখে উচ্ছলতার ছাপ ফুটে উঠেছে। খোন্দকার বাড়ির অশান্তির ছোঁয়া যেন তাকে এখনও স্পর্শ করেনি।

বললেন মিঃ আলী–কি করা হয়?

নেহাল জবাব দেবার পূর্বেই জামাল সাহেব বললেন–বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ হয়ে সবে বেরিয়ে এসেছে। ভাইদের মধ্যে নেহালই উচ্চডিগ্রি লাভ করতে সক্ষম হলো। আমরা সবাই ঐ কলেজ পর্যন্তই শেষ! নেহালকে লক্ষ্য করে বলরেন এবার তিনি যাও তুমি!

নেহাল চলে গেলো।

জামাল সাহেব বললেন–আর কিছু জানবার আছে আপনাদের?

মিঃ আহমদ আলী বললেন–হাঁ, আর একটা প্রশ্ন আছে, আপনাদের বড় ভাই খোন্দকার খবির সাহেবের স্ত্রী সেদিন রাতে কোন কক্ষে ছিলেন?

ও এই প্রশ্ন?

হাঁ, জানা দরকার।

আমার বড় ভাই আজীবন অবিবাহিত।

আর আপনারা?

আমাদের মধ্যে আমি এবং খোন্দকার আবদুল্লাহ বিবাহিত, কামাল আর নেহাল এখনও বিয়ে করেনি।

তাহলে খোন্দকার বাড়িতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা নিতান্ত কম, কি বলেন? বললেন মিঃ আহমদ আলী।

জামাল সাহেব বললেন–হাঁ।

তার চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে এবার। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই নজরে পড়লো রবিউল্লা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জামাল সাহেবের গল্প শুনছে।

ধমক দিলেন জামাল সাহেব–হতভাগা, তুই এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছিস?

সাহেব, শুনছিলাম যদি কিছু ভুল করেন তাবে মনে করিয়ে দেবো! কথা ক'টি বলে নাস্তার প্লেটগলো গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায় রবিউল্লা।

এ বাড়ির পুরোন চাকর বলে তাকে কেউ কিছু বলে না। ইচ্ছামত সে কাজ করে, তবে বোকামির জন্য মাঝে মাঝে গালমন্দ শোনে।

রবিউল্লা যে এতক্ষণ কাজ ফেলে এক কোণে দাঁড়িয়েছিলো, এটা কেউ লক্ষ্য করেনি বা দেখেনি। একপাশে দাঁড়িয়ে সে সব কথা যেন গিলছিলো। অবশ্য শুধু আজ নয়, সে প্রায়ই এমনি করে কেউ কোনো কথা বলতে শুরু করলে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে শুনবে, যেন তাকেই বলা হচ্ছে কথাগুলো।

এজন্য রবিউল্লা বহুদিন বহু গালাগাল শুনেছে তবু এ অভ্যাস তার যায়নি। কথাগুলো শুনে হজম করার বান্দা সে নয়, যত কথা শুনবে সব সে গল্প করে শোনাবে আর একজনকে, না হলে তার পেটের ভাত নাকি হজম হয় না।

এ কারণে অনেক সময় বাড়ির একজনের কথা অপরকে বলায় নানা কলহের সূত্রপাত হয়েছে, তার জন্য তাকে বহু গালাগাল করেছে বা তার শুনতে হয়েছে, তবু এ অভ্যাস তার যায়নি।

আজকাল যা সে শোনে রাতে গাঁজা টানার সময় সব সে উদগীরণ করে বন্ধু ভুলুর কাছে। যদিও ভুল তার একটা কথাও মনোযোগ সহকারে শোনে না। আর শুনেই বা সে কি করবে, খোন্দকার বাড়ির ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর তার কিইবা দরকার।

রবিউল্লা গাঁজা টানার সময় যখন বক বক করে নিজের পেটের কথাগুলো ঢালতে থাকে তখন মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয় ভুলু কিন্তু কি করবে, না শুনলে রবিউল্লা মুখ ভার করবে, তাই তাকে শুনতে হয়।

আজ ভুলু যখন গাঁজায় দম দিচ্ছিলো তখন রবিউল্লা সকালে শোনা সব কথা মালা গাঁথার মত ঠিক গুছিয়ে নিয়ে একটার পর একটা বলে যায়। সামান্য কথাটাও সে ভুল করে বাদ ফেলে না বলতে।

রবিউল্লা যখন পুকুরপাড়ে চটি জুতোটার কথা বলছিলো তখন ভুলুর হাত থেকে গাঁজার কলকেটা খসে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলো, অস্ফুট কণ্ঠে ঢোক

গিলে বললো–কি বললি রবিউল্লা? তোদের বড় সাহেবের চটির একপাটি পাওয়া গিয়েছিলো পুকুরপাড়ের সিঁড়ির ধাপে!

হাঁ, এখনও সে চটিটা জামাল সাহেব যত্ন করে তুলে রেখেছেন তালা বন্ধ করে ছোট এক বাক্সের মাধ্যে।

ও তাই তো, চটি জুতোটা খুব দামী বুঝি?

দামী হবে কেনা, পুরোন চটি।

তবে এত যত্ন করে রেখেছেন কেন জামাল সাহেব?

বারে রাখবো না, বড় ভাই সাহেবের শেষ স্মৃতিচিহ্ন

ও তাই বল।

রবিউল্লা এবার গজার কলকে হাতে নেয়, তারপর কয়েক টান দিয়ে আবার বলতে শুরু কলে……কামাল সাহেব এখন পাগল। সত্যি ভুলু ভাই, বড় সাহেব ভাইদের খুব ভালবাসতেন, তাই বড় ভাইয়ের শোকে কামাল ভাই পাগল হয়েছে।

এমন সময় শোনা যায় ভিতরবাড়ি থেকে অট্টহাসির শব্দ হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসছে কেউ। তার পরপরই শোনা যায় কাদার আওয়াজ করুন সুরে কাঁদছে সে।

বললে ভুলুকে এমন হাসলো, আবার কাঁদছে…..।

ওই তো কামাল ভাই। কখনও হাসেন কখনও কাঁদেন। যাবি ভাই তুই ওর কাছে?

সর্বনাশ, আমি যাবো পাগল দেখতে! যদি মারে তখন কি হবে?

তুই এক পাগল ভুলু কামাল ভাই কাউকে মারেন না, শুধু হাসেন–কাঁদেন এই যা। আর কোনো কোনো সময় বাড়ির জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তছনছ করে ফেলেন। চল্ ভুলু দেখবি চল্ কামাল ভাইয়ের করুণ অবস্থা।

কিন্তু……।

না, কোনো কিন্তু নেই চল।

ভুলু কলকে রেখে অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠে দাঁড়ালো।

রবিউল্লার সঙ্গে এগিয়ে যায় সে তার পিছনে পিছনে।

খোকার বাড়ি ঝিমিয়ে পড়েছে। যার যার ঘরে নিদ্রায় অচেতন সবাই। উঠানোর এপাশে ডিমলাইট জ্বলছে। ডিম লাইটের আলোতে বিরাট উঠানখানা কেমন যেন নিষ্প্রভ মনে হচ্ছিলো।

উঠানে পা দিয়ে ভুলু রবিউল্লার জামা এঁটে ধরে ফিস ফিস করে বললো–আমার গা কেমন হম্ ছম করছে রবিভাই।

ঘাড় পিরিয়ে বললো রবিউল্লা–কেন রে?

কেমন যেন ভূতুড়ে বাড়ির মত লাগছে। বললে ভুলু।

রবিউল্লা বললোআমি সঙ্গে আছি, কোনো ভয় নেই।

সত্যি বলছিস তো?

হাঁ, তুই আমার সঙ্গে আয়।

রবিউল্লার পিছনে পিছনে ভুলু এসে দাঁড়ায় একটা কক্ষের পাশে, ভিতর থেকে তখন করুণ কান্নার ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছিলো।

রবিউল্লা বললো–এই জানালা দিয়ে দেখ ভুলু, কামাল ভাইয়ের অবস্থাটা একবার দেখ।

ভুলু বললো–আমি দেখতে পাচ্ছি না।

এই ইটখানার উপরে উঠে দাঁড়া, ঠিক দেখতে পাবি।

ভুলু ইটখানার উপরে উঠে দাঁড়ালো, তাকিয়ে দেখলো হাত দু'খানা দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কামাল সাহেব। মুখের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা গেলো কামাল সাহেবের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। দেহটা

ক্ষীণ দুর্বল হয়ে গেছে। চুলগুলো বেশ লম্বা, ঘাড় পর্যন্ত ঝুলছে। যত্নের অভাব তাকে দেখলে খুব বোঝা যায়।

বললো রবিউল্লা–রাতে ঘুমায় না, শুধু বসে বসে কাটিয়ে দেয়। তবে হাঁ, কোন কোন সময় ঘর থেকে কোথায় যে নিখোঁজ হয়ে চলে যায় কেউ তাকে দেখতে পায় না। যখন রাত গম্ভীর হয় তখন নিখোঁজ হয়, শুধু ফাঁকা ঘরখানা পড়ে থাকে....

ভুলু বললো–আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই, চল যাই।

চল। রবিউল্লা আর ভুলু বেরিয়ে এলো অন্তপুর থেকে।

*

ভুলু, রোজ রাতে তুই কোথায় যাস বলতো? রাগতভাবে কথাটা বললো রীনা।

ভুলু হাতে হাত কচলে বললো–একটু বন্ধুর কাছে যাই।

বন্ধু!

হাঁ।

তোর আবার বন্ধু কে রে?

ঐ খোন্দকার বাড়ির রবিউল্লা।

সেই বুড়োটা?

আমিও বুড়ো সেও বুড়ো, তাই তো আমাদের মধ্যে এত ভাব। আপামনি, কাজের কোনো ক্ষতি করে আমি যাই না।

কেন যাস?

একটু প্রাণ খুলে গল্প করতে......

এত কি গল্প তোদের শুনি?

কত গল্প, ওর পেটভর্তি গল্প আছে আপামনি। একদিন রবিউল্লাকে ডেকে আনবো? শুনবে ওর গল্প?

তুই শোনগে, আমার এত গল্প শোনার সময় নেই। শোন্ ভুলু, রাতে পাহারা দেওয়া বন্ধ আর যাবি না, বুঝলি?

আচ্ছা

আচ্ছা নয়, যদি যাস্ কঠিন শাস্তি দেবো তোকে।

কিন্তু জরুরি দরকার, না গেলেই যে নয় আপামনি? যাব আর আসবো, মিথ্যে কথা বলছি না…

ও বাড়ি এখন ভূতুড়ে বাড়ি হয়েছে। কখন তোর ঘাড় মটকে দেবে, বুঝতে পারবি তখন মজাটা।

রীনা যতই বলুক ভুলু না গিয়ে পারলো না। গাঁজার নেশা কম নয়, সমস্ত ফাংহা শহর যখন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো তখন ভুলু সকলের অলক্ষ্যে গিয়ে হাজির হলো খোন্দকার বাড়িতে রবিউল্লাহর ঘরে।

*

রাত তখন চারটা।

আলোর আড়ালে আত্মগোপন করে একজন এসে দাঁড়ালো পুকুরপাড়ের ঝামগাছের তলায়। পরনে তার ফুলপ্যান্ট, গায়ে ওভারকোট, মাথায় ক্যাপ। ক্যাপ দিয়ে মুখের অর্ধেক অংশ ঢাকা।

অন্তরালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো পুকুরের পানি এবং পুকুরঘাটের সিঁড়ির দিকটা। এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো সে তাকে কেউ দেখতে পাবে না বা পাচ্ছে না, জমাট অন্ধকার রাত।

সমস্ত খোন্দকার বাড়ি নীরব নিঝুম। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের সন্ সন্ আওয়াজ হচ্ছে শাল বৃক্ষের পাতায়। দু’একটা পাতা ঝরে পড়ছে এপাশে ওপাশে!

ওভারকোট পরিহিত ব্যক্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে পুকুরপাড় এবং পুকুরের পানির দিকে।

হঠাৎ কে যেন তার কাঁধে হাত রাখলো, সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার ঠেকলো তার পিঠে।

চমকে ফিরে তাকালো ওভারকোট পরিহিত ব্যক্তি। ততক্ষণে আরও দুজন ব্যক্তি তাকে ধরে ফেললল, তাদের হাতেও আগ্নেয় অস্ত্র।

একজন অন্ধকারেই তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো।

অবশ্য ওভারকোট পরিহিত ব্যক্তি আপত্তি জানাতে পারতো মানে দু'চার ঘুষি বসিয়ে দিতে পারতো অথবা কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলখানা খুলে নিয়ে উদ্যত করে ধরতে পারতো কিন্তু সে সুযোগ পেলো না সে। রিভলভারখানা তার পিঠে চেপে বসেছিলো সর্বাগ্রে, তাই ওভারকোট পরিহিত ব্যক্তি টু শব্দ পর্যন্ত করতে পারলো না।

তাকে গ্রেপ্তার করার পর ইন্সপেক্টার কিবরিয়া পুলিশদ্বয়কে হুকুম করলেন– খোন্দকার বাড়ির সম্মুখে নিয়ে এসো।

কিন্তু টর্চ জ্বালতেই বিস্ময়ে লজ্জায় হতভম্ব হলেন মিঃ কিবরিয়া। তিনি এবং পুলিশদ্বয় দেখলেন তারা। যাকে গ্রেপ্তার করেছেন, তিনি হলেন গোয়েন্দা প্রধান মিঃ আহমদ আলী।

তিনি কাউকে না জানিয়ে অতি সন্তর্পনে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে খোন্দকার বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন। মিঃ আহমদ আলী সেদিন জামাল সাহবের কথায় বেশ বুঝতে পেরেছিলেন খোন্দকার বাড়ির রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ পুকুরের অতল পানির তলায়। তাই তিনি কদিন থেকে একা একা খোন্দকার বাড়ির প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং পুকুরপাড়ের ঝামগাছটার আড়ালে এসে দাঁড়ায়। গোপনে সন্ধান নেওয়াই তার মূল উদ্দেশ্য।

ওদিকে ইন্সপেক্টার কিবরিয়াও আজ কদিন থেকে দু'জন অস্ত্রধারী পুলিশমহল দূর থেকে খোন্দকার বাড়ির উপর লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি তিন দিন দেখেছেন একটি জমকালো ছায়ামূর্তি প্রাচীর টপকে খোন্দকার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে এবং একসময় বেরিয়ে আসে সকলের অলক্ষ্যে।

ইন্সপেক্টার কিবরিয়া তাকে অনুসরণ করেও কোনো ফল পাননি, কারণ ছায়ামূর্তি প্রাচীর টপকে ভিতরে যায়, তারপর সে যেন হাওয়ায় মিশে যায়। আবার যখন বেরিয়ে আসে তখনও ঠিক সেই অবস্থা, কোথা থেকে আসে আবার কোথায় চলে যায় ঠিক বুঝতে পারেন না কিবরিয়া সাহেব।

তাই তিনি অতি সাবধানে রিভলভার হাতে আজ সন্ধ্যার পর এসে দাঁড়িয়েছিলেন পুকুরপাড়ের অদূরে হাস্নাহেনা ঝোঁপটার আড়ালে। কেউ তাদের দেখতে পায়নি, বুঝতেও পারেনি তাদের অবস্থানের কথা।

রাত বাড়ছিলো।

চারিদিকে থমথমে জমাট অন্ধকার।

মশা কামড়াচ্ছিলো ঘাড়ে মুখে, শরীরের বাকি অংশ ঢাকা ছিলো বলে রক্ষা তাদের। যেন কোনো শব্দ না হয়, সেদিকে ছিলো কিবরিয়া সাহেবের তীক্ষ্ণ নজর এবং তিনি সঙ্গী পুলিশদ্বয়কে ভালভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন তারা যেন কোনো শব্দ না করে।

ইন্সপেক্টর সাহেবের হুকুম অমান্য করার সাহস তাদের ছিলো না, তাই তারা মশার কামড় নীরবে হজম করেও আজ তিন রাত্রি কাটিয়ে দিলো খোন্দকার বাড়ির পুকুরপাড়ের হাস্নাহেনার ঝোঁপটার আড়ালে।

দু'দিন লক্ষ্য করেছেন কিবরিয়া সাহেব ছায়ামূর্তিটাকে। কিন্তু তিনি তাকে শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখেছেন, তারপর এক সময় বেরিয়ে গেছে ছায়ামূর্তি প্রাচীর টপকে বাইরে।

কিবরিয়া সাহেব বাহিরেও তাকে অন্তর্পণে করেছেন কিন্তু তাকে আর দেখতে পাননি। আজ তিনি অতি সন্তর্পণে পুলিশদ্বয় সহ ছায়ামূর্তির ঠিক পিছনে এসে হাজির হলেন এবং রিভলভার চেপে ধরে তাকে গ্রেপ্তার করলেন, যেন একচুল নড়তে না পারে ছায়ামূর্তি।

এক্ষণে টর্চ জ্বালতেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর কিবরিয়া। তিনি দ্রুত নিজের হাতে মিঃ আহমদ আলীর হাত থেকে হাতকড়া খুলে দিয়ে বললেন– ছিঃ ছিঃ এমন ভুল হবে তা ভাবতেও পারিনি। মাফ করুন আলী সাহেব।

মিঃ আহমদ আলী মনে মনে রেগে গেলেও প্রকাশ্য বললেন—ভুল করেছে এতে মাফ চাইবার কি আছে। এমন ভুল আমারও তো হতে পারতো।

এমন সময় রবিউল্লা চিৎকার করে উঠলো–ডাকাত, ডাকাত, পুকুরপাড়ে ডাকাত.......

রবিউল্লার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন খোন্দকার জামাল সাহেব, তার পিছনে অন্য সবাই। সবার হাতেই লাঠিসোটা, দাও–বল্লম। ঘুম ভেঙে যেতেই যে যা পেলো নিয়ে ছুটে এসেছে।

রবিউল্লার পিছনে ভুলু, নেশায় ঢুলু ঢুলু করছে তার চোখ দুটো।

ভুলুকে রবিউল্লা এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলো ফটকের দিকে, ঠিক সেই মুহূর্তে রবিউল্লার চোখে পড়ে টর্চের আলো। টর্চের আলোতে সে দেখতে পেরেছিলো একজন বা দুজন নয়, চার পাঁচজন লোক পুকুরপাড়ে আমগাছের তলায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রবিউল্লার চিৎকার শুনে ভুলু বলে উঠেছিলো–নেশা করেছি তাই চোখে ধা ধা দেখছিস, ডাকাত কোথায় বাবা?

কেন ঐ যে পুকুরপাড়ে?

ওরা ডাকাত না অন্য কেউ,

ঠিক ঐ মুহূর্তে বেরিয়ে আসে খোন্দকার বাড়ির লোকজন।

বাবুর্চি? শাখাওয়াত লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে আসে। লণ্ঠন উঁচু করে ধরতেই অবাক হলেন জামাল সাহেব এবং অন্য সকলে।

পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন পুলিশ ইন্সপেক্টার কিবরিয়া, দু'জন পুলিশ আর গোয়েন্দা প্রধান মিঃ আহমদ আলী। সবার মুখেই হতভম্ভতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

অবশ্য ততক্ষণে গোয়েন্দা প্রধানের হাত থেকে হাতকড়া খুলে ফেলা হয়েছিলো, নইলে আরও বিভ্রাট ঘটতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জামাল সাহেব বললেন ব্যাপার কি?

মিঃ কিবরিয়া জবাব দিলেন–আমরা আমাদের কাজে এসেছি, আপনাদের আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। এবার তিনি মিঃ আহমদ আলীকে লক্ষ্য করে বললেন–চলুন আলী সাহেব, এবার ফেরা যাক।

জামাল সাহেব এবং অন্য সবাই দাঁড়িয়ে রইলেন!

পুলিশদ্বয় সহ অফিসারদ্বয় বেরিয়ে গেলেন খোন্দকার বাড়ি থেকে।

জামাল সাহেব বললেন–বেচারী পুলিশ মহোদয়গণ কত না পেরেশান হচ্ছেন খোন্দকার বাড়ির গভীর রহস্য উদঘাটন ব্যাপারে। সত্যি দুঃখ হয় এত হয়রানি দেখে। শেষ পর্যন্ত পারবেন তো খোন্দকার বাড়িতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কথাগুলো আপন মনেই বলরেন জামাল সাহেব।

এমন সময় আবদুল্লাহ সাহেব এসে দাঁড়ালেন, তিনি বললেন–আমি জানতাম ডাকাতের ক্ষমতা নেই খোন্দকার বাড়িতে প্রবেশ করে তাই তো দৌড়ে আসিনি।

রবিউল্লা আর ভুলু তখন সরে পড়েছে সেখান থেকে।

আবদুল্লাহ সাহেব হাই তুলে বলনে–চলুন ভাইয়া, যতসব বাজে ঝামেলা।

জামাল সাহেব অবাক কণ্ঠে বললেন–বাজে? মোটেই বাজে ঝামেলা নয়। পুলিশমহল আমাদের সহায়তা করছেন বলেই তো একটু নিশ্চিন্ত আছি, নইলে.....কথা শেষ না করেই অন্তপুরে প্রবেশ করেন আবদুল্লাহ সাহেব এবং জামাল সাহেব।

*

সর্দার, আপনার বিলম্বের কারণ আমি জানতে পেরেছি। নাসরিন ওয়্যারলেসে আমাকে সব কথা জানিয়েছে। কথাগুলো বলে থামলো রহমান।

বনহুর সবেমাত্র শরীর থেকে জামাটা খুলে মুক্ত জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখমন্ডল গম্ভীর, দৃষ্টি শহরের অগণিত ছোটবড় দালানকোঠার দিকে সীমাবদ্ধ। রহমানের কথায় বললে বনহুর–তাহলে তুমি সব শুনেছো?

হাঁ সর্দার।

এ সংবাদ শুনেও তুমি বিচলিত হওনি?

সর্দার, জানি আপনি ফুল্লরার সন্ধান করে চলেছেন, তাই আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম।

কিন্তু আমি বিফল হয়েছি। রহমান আমার সামান্য ভুলের জন্য এতবড় একটা কান্ড ঘটে গেলো। আমি জানতাম না সেই নীলমনি হার এত অপেয়া ছিলো।

সর্দার, আপনি ভাল মনে করেই ফুল্লরাকে নীলমনি হার পরিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু এমন হবে তা কি জানতেন!

জানলে এমন ভুল আমি করতাম না। কিন্তু মালোয়া নিস্তার পাবে না, যেখানেই সে থাকুক তাকে আমি শায়েস্তা করবোই। রহমান, ফুল্লরা যেখানেই আছে নিশ্চয়ই সে ভাল থাকবে, আমি তাকে খুঁজে বের করবোই।

সর্দার, আমি নিশ্চিন্তই আছি এবং থাকবো।

হাঁ, তুমি ধৈর্য ধরো রহমান।

সর্দার, আমি নাসরিনকে সে কথাই জানিয়ে দিয়েছি যে, সে যেন ভেঙে না পড়ে। ফুল্লরা যেখানেই থাক ভাল থাকবে, ভাল আছে। মালোয়া ওর কোনো ক্ষতি সাধন করবে না বা করতে পারবে না।

বনহুর আসন গ্রহণ করে বলে–খোন্দকার বাড়ির সংবাদ কি রহমান?

সর্দার, আবারও বাড়ি থেকে আরও একজন উধাও হয়েছে।

সত্যি বলছো?

হাঁ সর্দার।

বনহুর সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। সোফায় হেলান দিয়ে বসে কয়েকমুখ ধোয়া ছড়িয়ে দিলো সে সম্মুখে, তারপর বললো–রহমান বসো।

রহমান এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো বনহুরের পাশে! এবার সে আসন গ্রহণ করে তাকালো সর্দারের দিকে।

রাশি রাশি ধোয়ার মধ্যে বনহুর যেন তলিয়ে গেছে। তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে সিগারেটের বোয়াকুন্ডলি। রহমান কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো–সর্দার, পুলিশমহল উঠে পড়ে তদন্ত চালিয়েও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। পুনরায় খোন্দকার বাড়ির পুরোন ঝি উধাও হয়েছে।

বিস্ময়কর বটে।

হাঁ সর্দার, পুলিশ অফিসারগণ হিমসিম খেয়ে গেছেন, পুলিশ গোয়েন্দাও হাঁপিয়ে উঠেছেন, কেউ খোন্দকার বাড়ির রহস্য ভেদ করতে পারছেন না। সর্দার, গভীর রাতে রীনার কক্ষের ছাদে কারও পদশব্দ শোনা যায়। আমার মনে হয় খোন্দকার বাড়ির সঙ্গে মিস রীনার বাড়ির সংযোগ আছে।

বনহুর নিশ্চুপ সিগারেট পান করে চলেছে।

রহমান বললো–আমার মনে হয় সবার ছোট খোন্দকার নেহালের মধ্যে কোনো রহস্য লুকানো আছে।

বনহুর এতক্ষণ নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো, এবার সে চট করে সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করে–কি করে বুঝলে রহমান, সবার ছোট খোন্দকার নেহালের মধ্যে রহস্য লুকানো আছে?

আমি গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছি নেহাল প্রতিদিন গভীর রাতে বাড়ি ফেরে এবং তার হাবভাব কেমন সন্দেহজনক মনে হয়।

বনহুর বললো–গভীর রাতে কেউ বাড়ি ফিরলেই তার হাবভাব সন্দেহজনক মনে করা সমীচীন নয় রহমান। নানা কারণে সে গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে কাটায়, এখনও তো হতে পারে। তবে খোন্দকার বাড়ির রহস্যের পিছনে রয়েছে খোন্দকার বাড়িরই কোনো ব্যক্তির অদৃশ্য ইংগিত। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে বনহুর–মিস রীনা কেমন আছে?

ভালই আছে সর্দার। তবে সব সময় ভয় আর দুর্ভাবনায় কাটায়। একদন্ড বাইরে যেতে দেয় না, না জানি কখন কোন বিপদ আসে, তাই ওর ভাবনা।

হাঁ, বেশিক্ষণ বাইরে তোমার দেরী করা উচিত হবে না। যাও তুমি।

সর্দার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

বলো?

শুনলাম লুসিকে আপনি পুনরায় দেখেছেন?

হাঁ, সে কথা তোমাকে কে জানিয়েছে রহমান?

নূরী! নূরী জানিয়েছে সর্দার।

ও, নূরীর সঙ্গে তাহলে কথা হয়েছে তোমার?

হাঁ, সেই আমাকে জানিয়েছে লুসি সম্বন্ধে।

তাহলে সবই জেনে নিয়েছো ফাংহায় বসে। কিন্তু লুসিকে ফিরে পেয়ে কোনো ফল হলো না রহমান। মৃত লুসি আবার মৃত্যুবরণ করলো। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো বনহুর–পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে হাজার ফিট নিচে গড়িয়ে পড়েছিলো লুসি।

বুঝতে পেরেছি লুসির মৃত্যু ভয়ঙ্কর ভয়াবহ মৃত্যু......সর্দার, লুসির মৃত্যু আপনাকে ভীষণ দুঃখ দিয়েছে জানি।

তার চেয়েও দুঃখ পেয়েছি ফুরাকে হারিয়ে...একটু থেকে দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর– ফুল্লরাকে চুরি করে নিয়ে মালোয়া ভাল করেনি, ওর মাংসপিন্ড আমি বাঘাকে খাওয়াবো।

বনহুর আর রহমান যখন বাঘার সম্বন্ধে বলছিলো তখন আশার আস্তানায় জাভেদ বাঘাকে নিয়ে খেলা করছিলো। একটা হরিণ শিকার করে তার মাংস চাকুর দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ছুঁড়ে দিচ্ছে জাভেদ বাঘার মুখ গহ্বরে। বাঘা গোগ্রাসে তা খাচ্ছে।

বাঘার চোখ দুটো জ্বলছিলো অগ্নিগোলকের মত। দু পাশে দুটি ধারালো ছোরার মত সূতীক্ষ্ণ দাঁত। চিবুকের পাশ দিয়ে কালো ফিতার মত দুটি রেখা ঘাড় পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।

বাঘা তো নয়, যেন একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ওকে দেখলে যে কোন ব্যক্তির বুক কেঁপে উঠবে, শরীর শিউরে উঠবে, তাতে কোনো ভুল নেই।

জাভেদ যখন বাঘাকে মাংস খাওয়াচ্ছিলো তখন আশা এসে দাঁড়ালো তার পাশে। ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে আশা–জাভেদ, অনেকদিন হলো তুমি তোমার মাকে ছেড়ে এসেছো। চলো এবার তোমাকে তার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।

এখানে তো আমার মোটেই খারাপ লাগছে না মাম্মি?

আশা ওকে চলেছিলো, আমাকে তুমি আম্মি ডাকবে জাভেদ। আমি তাতে বেশি খুশি হবো, বুঝলে?

অবশ্য কথাটা যেদিন আশা জাভেদকে বলেছিলো তখন বনহুর ছিলো তাদের পাশে। বনহুর হেসে বলেছিলো–তুমি যদি খুশি হও জাভেদ তোমাকে আম্মি বলেই ডাকবে!

সেই থেকে জাভেদ আশাকে আম্মি বলেই ডাকে।

জাভেদকে আশা নিজ সন্তানের মতই মনে করে এবং ভালও বাসে তেমনি। শুধু আশা জাভেদকে স্নেহ করে তাই নয়, জাভেদও আশাকে খুব শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

আশা জাভেদ আর বাঘাকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। সেই সর্বক্ষণ জাভেদকে নানাভাবে অস্ত্রশিক্ষা দেয়, অশ্বচালনায় দক্ষ করে তোলে।

ঘোড়ার পিঠে বসে আশা সম্মুখে জাভেদকে রাখে! ঘোড়ার লাগামের এক অংশ আশা ধরে, অপর অংশ সে জাভেদের হাতের মুঠায় দেয়, তারপর দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করে সে।

তীরবেগে অশ্ব ছোটে, তার খুরের প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠে শুষ্ক মাটির বুক। প্রান্তর পেরিয়ে বনভূমি, বনভূমি পেরিয়ে ঘন জঙ্গল, তারপর পর্বতের পাশ কেটে সরু সঙ্কীর্ণ পথ ধরে অশ্বচালনা করে আশা। সম্মুখে পর্বতের গায়ে ফাটল, তারপর আবার পথ।

আশা অশ্বের লাগাম টেনে ধরে জাভেদকে বলে–খুব শক্ত হয়ে থাকবো।

জাভেদ বললো–পড়ে যাবো না তো নিচে।

না পড়বে না জাভেদ, এই দেখো।

ঘোড়া পিছিয়ে আসে খানিক, তারপর খুব দ্রুত এগিয়ে যায় এবং এক লাফে পেরিয়ে যায় ফাটলটার ওপারে।

জাভেদ হর্ষধ্বনি করে উঠে।

আশা এমনি করে জাভেদকে অশ্বচালনায় দক্ষ করে তোলে। দক্ষ করে তোলে অস্ত্র চালনায়। রহমান আর আশার কাছে জাভেদ পায় তার শিক্ষা।

বালক হলেও জাভেদ একজন দক্ষ অশ্বারোহী এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে। তেমনি তীর চালনায় তার সমকক্ষ বুঝি আর কেউ নেই। তীর চালনা শিখেছে জাভেদ তার মাম্মির কাছে।

জাভেদ এত ছোট বয়সে এমন অশ্বচালনা শিখেছে, নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না কেউ।

রহমান একদিন অবাক হয়ে বলেছিলো, সাবাস, বাপ কা বেটা......

জাভেদ শুনে হেসেছিলো সেদিন।

তেমনি আশাও জাভেদের অশ্বচালনায় বিস্মিত না হয়ে পারেনি। এত ছোট ছেলে হয়ে মস্তবড় বীরের মত তার কার্যকলাপ। সেই কারণেই আশা জাভেদকে নিজের কাছে রেখে তাকে পাকা করে তুলছিলো।

কমাস হলো এসেছে জাভেদ, অবশ্য বাঘাকে নিয়ে এত বেশি মেতে আছে যে, আস্তানায় ফিরে যাবার কথা একেবারে ভুলেই গেছে সে।

জাভেদের কথায় বললো আশা–তোমার খারাপ না লাগলেও তোমার আম্মির খারাপ লাগছে। কতদিন হলো এসেছো? বলো কবে যাবে তুমি।

আমি বাঘাকে কিন্তু নিয়ে যাবো?

বেশ তো যেও কিন্তু এখন নয়, ফের যখন আসবে তখন, কেমন?

আচ্ছা।

পরদিন আশা পুরুষের পোশাকে সজ্জিত হয়ে জাভেদকে তুলে নিলো নিজের অশ্বপৃষ্ঠে।

বাঘা তখন লেজ নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলো।

জাভেদ হাত নাড়ে।

বাঘা দাঁড়িয়ে থাকে পাহাড়ের উঁচু একটা টিলার উপরে।

আশার অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটতে শুরু করে।

বনজঙ্গল পেরিয়ে, পাহাড়ের পাদদেশে দিয়ে আঁকাবাঁকা পাথুরিয়া পথ অতিক্রম করে, প্রান্তর পেরিয়ে ছুটে চলেছে আশার অশ্ব।

আশার অশ্ব তাজের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তবে বর্ণ কিছুটা আলাদা। বনহুরের অশ্ব জমকালো আর আশার অশ্ব কিছু লালচে ধরনের। তবে একেবারে লাল নয়।

আশার নির্দেশ পেলে হাওয়ার বেগে চলে এ অশ্ব।

তবু দুদিন দু’রাত্রি কেটে গেলো তাদের পথে।

প্রথম রাত্রি কাটলো জংলীসর্দার মংলু খাঁর আড়ায়। দ্বিতীয় রাত্রি এক নির্জন পোড়ড়া ডাকবাংলোয়।

জংলী মংলু খাঁ আশাকে নিজ কন্যার মত মনে করতো, কারণ মংলু খাঁ আশার কাছে বিশেষভাবে উপকৃত ছিলো।

তার রাজ্যে একবার বিপদ দেখা গিয়েছিলো। ডাকু মনসুর দলবল নিয়ে আক্রমণ করেছিলো মংলু খাঁর আস্তানায় এবং মংলু খুঁকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো নিজের আড্ডায়।

মংলু খাঁ বন্দী হয়ে ক্রুদ্ধ বাঘের মত ফোঁস ফোঁস করছিলো কিন্তু তার কোনো উপায় ছিলো না মুক্ত হবার। তাকে একটা কাঠের খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো। হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাধা ছিলো। পরদিন মংলু খাঁকে হত্যা করবে মনসুর ডাকু।

আশা জানতে পারে এবং কৌশলে তাকে বন্দীখানা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলো।

আশার সহায়তায় প্রাণ ফিরে পেলো মংলু খাঁ। আশাকে আশীর্বাদ করে নিজ কন্যা বলে গ্রহণ করেছিলো। সেইদিন থেকে মংলু খাঁ আমাকে সমীহ করে, স্নেহভরা চোখে দেখে।

পথে রাত হওয়ায় আশা মংলু খাঁর আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছিলো জাভেদসহ। মহা আনন্দে মংলু খাঁ তাদের দুজনকে আশ্রয় দিয়েছিলো। প্রচুর ফল এবং হরিণের মাংস দিয়ে সমাদর করেছিলো তাদের।

পরদিন মংলু খাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিলো। তারপর হিন্দলের নিকটে এক পোড়ো ডাকবাংলোতে বেশ ভয় লাগছিলো জাভেদের, কারণ নিঝুম রাত, কোথাও এতটুকু জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই, তারপর ছিলো না কোনো আলো।

আশার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলো জাভেদ, তারপর ভোরে আবার যাত্রা হয়েছিলো শুরু।

আশা আর জাভেদ যখন কান্দাই জঙ্গলে বনহুরের আস্তানার নিকটে পৌঁছলো তখন জাভেদের আনন্দ ধরে না। আশা তাকে আস্তানার অদূরে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে কিন্তু জাভেদ তাকে যেতে দিলো না, ধরে নিয়ে এলো আস্তানায়।

নূরী আশাকে দেখে সাদর সম্ভাষণ জানালো। জাভেদ জড়িয়ে ধরলো তার মাকে, খুশিতে উচ্ছল হয়ে ডাকলো–আম্মি।

নূরী জাভেদকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো–জাভেদ।

আশার দু'চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে যায়। মাতাপুত্রের মিলন-দৃশ্য তাকে অভিভূত করে। কিন্তু যখন আশা জানতে পারে নাসরিনের কন্যা ফুল্লরা নিখোঁজ

হয়েছে, তাকে মালোয়া নাম এক অনুচর নিয়ে ভেগেছে, ফুল্লরার মা নাসরিন তাই কেঁদে কেঁদে পাগলিনী প্রায় হয়ে পড়েছে, তখন আশার মন ব্যথায় ভরে উঠে। সে নীরবে চোখ মুছলো।

সান্তনা দিলো আশা, আজ থেকে সেও শয়তান মালোয়ার সন্ধান করবে এবং সেই কারণে মালোয়ার চেহারার বর্ণনা জেনে নিলো আশা ভালভাবে। ফুল্লরাকে আশা দেখেনি, তাই তার সম্বন্ধেও জেনে নিলো। পুংখানুংখরূপে।

আশা একদিন বনহুরের আস্তানায় অপেক্ষা করার পর বিদায় গ্রহণ করলো।

আশার সৌন্দর্য এবং তার ব্যবহারে মুগ্ধ হলো নূরী। আস্তানায় অন্য সকলেও খুশি হয়েছে তার আচরণে। বিদায় মুহূর্তে সবার চোখ অশ্রুসজল হলো।

*

একটা নীলাভ আলোর গোলক খোন্দকার বাড়ির বাগানবাড়ির মধ্যে জ্বলে উঠলো, তারপর আলোর বল থেকে বেরিয়ে এলো একটা লালচে আলোকরশ্মি, অদ্ভুত এবং ভয়াল সে আলোকছটা।

তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেলো আলোটা, কিন্তু আলোকরশ্মি কিছুক্ষণ হাল্কাভাবে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

ওদিকে তখন পুকুরের পানিতে ভীষণ তান্ডবলীলা চলছে। তোল–পাড় শুরু হয়েছে পুকুরের অতল গহ্বরে।

ভেসে উঠে একটা বাক্স।

বাক্সটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ঘাটের দিকে। জমাট অন্ধকারে কিছু নজরে পড়ছে না। বাক্সটা ঘাটে লাগতেই বাক্সের উপরিভাগের ঢাকনা খুলে যায়। বেরিয়ে আসে এক ছায়ামূর্তি, তারপর সে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে বেয়ে আসে উপরে।

সকলের অলক্ষ্যে আত্মগোপন করে চলে যায় সে খোন্দকার বাড়ির খিড়কি জানালা দিয়ে ভিতরবাড়িতে। হঠাৎ একটা চিৎকার ভেসে আছে।

ঘুম ভেঙে যায় বাড়ির সকলের।

সবাই যে যার কক্ষের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। রবিউল্লা আর ভুল তখন গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে ছিলো, তাদের কানেও পৌঁছলো এই আর্তচিৎকার, তারাও টলতে টলতে প্রবেশ করলো ভিতর বাড়ির উঠানে।

আলো জ্বললো, সঙ্গে সঙ্গে সবাই দেখলো নেহাল জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে আছে উঠানের একপাশে। তার জামার বাম পাশ রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে।

সবাই ঝুঁকে পড়লো, দেখতে লাগলো নেহালকে। কেউ নেহালের বুকের বামপাশে সূতীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে কিন্তু সম্মুখে সেই অস্ত্র বিদ্ধ না হওয়ায় বেঁচে গেছে নেহাল, তবে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

জামাল সাহেব এবং আবদুল্লাহ সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন। তারা ছোট ভাইয়ের এই নৃশংস অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু কামাল কোথায়, কামালকে তার ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাড়ির সবাই যখন নেহালকে নিয়ে ব্যস্ত তখন জামাল সাহেব কামালের সন্ধান করে ফিরছেন।

রবিউল্লা ভুলু কানে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললো–পাগল বলে কতইনা গালমন্দ করেন, আবার একটু দৃষ্টির আড়াল হয়েছে কামাল ভাই, আর মেঝো সাহেব দেখ কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ওদিকে নেহাল ভাইকে কে যে এমন নির্মমভাবে ঘায়েল করলো কে জানে।

আবদুল্লাহ সাহেব যেন নির্বাক হয়ে গেছেন, তার ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তারেখা। খোন্দকার বাড়ির রহস্য তাকে সব চেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। নেহালের অবস্থা দেখে তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছেন।

জামাল সাহেব বললো–হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছো আবদুল্লাহ, যাও শিগগির ডাক্তারের কাছে ফোন করো।

এতক্ষণে আবদুল্লাহর যেন সম্বিৎ ফিরে এলো, তিনি সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে গেলেন উপরে এবং ফোন করলেন ডাক্তারের কাছে।

নেহালকে তাড়াতাড়ি নিচের এক কামরায় শুইয়ে দিয়ে সবাই ধীরে ধীরে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে।

রক্ত বন্ধ করার জন্য চেষ্টায় আছে সবাই।

জামাল সাহেব দিশেহারার মত একবার কামালের সন্ধান করছেন, একবার ছুটে আসছেন নেহালের পাশে। তাকে দেখলে মায়া হয়, বেচারী কি করবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না।

ডাক্তার এলেন, নেহালকে পরীক্ষা করে বললেন তাকে আচম্বিতে কেউ আক্রমণ করে হত্যা করতে চেয়েছিলো কিন্তু ভাগ্য ভাল বেঁচে গেছে। ওষুধ দিয়ে ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে দিলেন এবং সাবধানে রাখতে বলে তিনি বিদায় নিলেন।

ডাক্তার চলে যাবার পর হঠাৎ অট্টহাসির শব্দ শোনা গেলো!

কিন্তু কোথা থেকে হাসির শব্দ আসছে।

সবাই গিয়ে দেখলো কামাল বসে আছে রান্নাঘরের খিড়কি জানালার তাকে। সেখানে কেউ সন্ধান করেনি, কারণ ওদিকে কেউ যা না বড় একটা।

কামাল নেমে এলো নিচে রান্নাঘরের খিড়কি জানালার তাক থেকে।

সবাই বিস্ময়ে হতবাক।

কামাল অবিরাম হেসে বলেছে, সে হাসি যেন থামতে চায় না।

জামাল সাহেব রাগে গস গস করে উঠলেন। তিনি মারবার জন্য ছড়ি আনতে গেলেন, সেই সময় কামাল ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো।

জামাল সাহেব বাইরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন–বাড়িতে এমন একটা বিপদ আর তুই হাসছিস? এতটুকু লজ্জা বোধ নেই তোর?

তবু কামালের হাসি কমে না, সে অবিরাম হেসে চলেছে।

ভুলু আর রবিউল্লা, দাঁড়িয়েছিলো একপাশে, জামাল সাহেব ধমক দিলেন–কি করিস রবিউল্লা, তুই থাকতে এমন অঘটন ঘটে যায়। রাতে বাড়ির চারপাশে ঘুরে

ঘুরে পাহারা দিবি, তা পারিস না। এবার তোকে বেতন কে দেয় দেখে নেবো। সব যেন কেমন হয়ে গেছে, সবার মধ্যে চলেছে চক্রান্ত। আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না। আমি আর কাউকেই বিশ্বাস করি না.......

আপন মনে জামাল সাহেব বক বক করে যান।

ঘটনার অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হলেন পুলিশমহলের লোক। মিঃ কিবরিয়া এবং মিঃ আহমদ আলীও এসেছেন। তিনজন পুলিশও এসেছে তাদের সঙ্গে।

নেহালের অবস্থা তারা তদন্ত করে বাড়ির সবার কাছে জবানবন্দী নিতে শুরু করলেন। মিঃ কিবরিয়া স্বয়ং জিজ্ঞাসাবাদ করছেন–খোন্দকার সাহেব, দিনদিন আপনাদের বাড়ি একেবারে রহস্যপুরী বনে যাচ্ছে। আমরা পুলিশমহল হিমসিম খেয়ে গেলাম। আমাদের জীবনে এমন অদ্ভুত বাড়ি এর আগে কোনোদিন দেখিনি।

থামলেন কিবরিয়া সাহেব, তিনি তাকালেন মিঃ আহমদ আলীর দিকে!

মিঃ আহমদ আলী বললেন–আমাদের পুলিশ গোপনে সব সময় খোন্দকার বাড়ির উপর কড়া নজরে রেখেছেন, তবু এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটছে, আশ্চর্য বটে!

জামাল সাহেব বললেন–আমার আর মোটেই ভাল লাগে না এসব। আজ একটা কাল সেটা রোজ একটা না একটা অঘটন ঘটেই চলেছে।

কিবরিয়া সাহেবের ললাটে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তারেখা, তিনি বললেন–আমার মনে হয় এমন কেউ এ বাড়ির সকলের পিছনে লেগেছে, যে চায় এ বাড়ির সবাইকে সরিয়ে নিজে আধিপত্য গ্রহণ করে।

কিন্তু কে সে? অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

জামাল সাহেব চমকে ফিরে তাকালেন–আপনি।

সবাই অবাক হয়ে দেখলেন–মিঃ আলম দাঁড়িয়ে আছে তাদের পিছনে।

কিবরিয়া সাহেব এবং মিঃ আহমদ আলী বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। তারা আলমকে চেনেন না, এমন কি তার পরিচয়টাও জানেন না।

জামাল সাহেবই বললেন–আপনারা অবাক হচ্ছেন। ইনি হলেন প্রাইভেট গোয়েন্দা মানে সখের গোয়েন্দা। এনার নাম হলো কি যেন ঠিক স্মরণ নেই আমার.......বলে তিনি তাকালেন আগন্তুকের দিকে।

আগন্তুক অন্য কেউ নয়, স্বয়ং দস্যু বনহুর। সে বললো–আমার নাম স্মরণ করতে পারবেন কি করে? কারণ ইনি সেদিন নিজেদের পরিচয় দিতে এতে বেশি ব্যস্ত ছিলেন, যার জন্য আমার নামটা জিজ্ঞাসা করার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

সত্যি, এ জন্য আমি লজ্জিত।

শুধু আপনিই ভুল করেননি খোন্দকার সাহেব, ভুল আমারও হয়েছে, কারণ নামটা আমি নিজেও জানাতে পারতাম আপনাকে।

যাক, তাহলে ভুল আমাদের দুজনারই সমান, কি বলেন? বললেন জামাল সাহেব।

বনহুর বললো–আমার নাম আলম।

জামাল সাহেব বললেন–ইনি ফাংহা পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ কিবরিয়া।

বনহুর হাত বাড়িয়ে হাত মিলালো মিঃ কিবরিয়ার সঙ্গে।

জামাল সাহেব এরপর মিঃ আহমদ আলীকে লক্ষ্য করে বললেন–ইনি পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা প্রধান মিঃ আহমদ আলী।

বনহুর হেসে বললো–আমি খুশি হলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে হাত মিলালো তার সঙ্গে।

জামাল সাহেবই বললেন পুনরায়–মিঃ আলম, আপনি সেই যে এলেন তারপর কোথায় ডুব মেরেছিলেন বলুন তো?

বনহুর কোনো জবাব দেবার পূর্বে বললেন খোন্দকার আবদুল্লাহ–আমি একদিন মিস রীনার বাসায় গিয়েছিলাম ওর সন্ধানে কিন্তু পাইনি।

হাঁ, আমি ছিলাম না, বিশেষ কোনো কারণে আমাকে ফাংহার বাইরে যেতে হয়েছিলো এবং তা ছাড়া আমি মিস রীনার বাসায় থাকি না কথাগুলো বললো বনহুর।

জামাল সাহেব বললেন–দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে কতক্ষণ আলাপ করবেন বসুন? আজ আমার নতুন এক বিপদ ঘটেছে মিঃ আলম এবং সে কারণেই এই মহামান্য অতিথিদ্বয় এসেছেন।

বনহুর বললো–আমি কোনো কারণে আজ রীনার বাসায় ছিলাম। আমার বন্ধু রহমান সেখানে থাকে, তাই নিতান্ত প্রয়োজনে আমাকে থাকতে হয়েছিলো। হঠাৎ একটা আর্তচিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাদে এসে দাঁড়াই। বুঝতে পারি খোন্দকার বাড়ি থেকেই এ আর্তচিৎকার ভেসে এসেছিলো, তাই আমি.....

জামাল সাহেব মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শেষ করলেন–তাই আপনি দৌড়ে এসেছেন।

হাঁ তাই।

এসে দৌড়াতেই শুনলেন এবং দেখলেন..

দেখলাম আপনারা ব্যস্ত রয়েছেন, আমার আগমনটাও বুঝতে পারেন নি।

এভাবে অন্দরবাড়িতে প্রবেশ করা.......

আমার উচিত হয়নি জানি কিন্তু বাইরে একটি প্রাণীকেও দেখতে না পেয়ে...

সোজা চলে এসেছেন ভিতরে, তাই না? রাগতভাবে বললেন জামাল সাহেব।

বনহুর বললো–একবার যখন আপনি জানতে পেরেছেন আমি কি কারণে এসেছিলাম তাই নতুন করে আর আপনাকে জানাতে হবে না, সেই ভরসা নিয়েই এসেছি। তাছাড়া খোন্দকার আবদুল্লাহ সাহেব যখন আমার বোন মিস রীনার বাড়িতে আমারই খোঁজে গিয়েছিলেন এবং হঠাৎ গভীর রাতে এই আর্তচিৎকার শুনে, তাই চুপ থাকতে পারলাম না, ছুটে এলাম।

বললেন মিঃ আহমদ আলী–থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ আলম, এসেছেন বলেই পরিচয় হলো। খুশি হলাম আমরা সবাই।

কিবরিয়া সাহেব ও মিঃ আহমদ আলীর কথায় যোগ দিয়ে বললেন–ঠিক তাই, তবে বেশি ফলাফল করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ইন্সপেক্টর সাহেব? কথাটা বললো বনহুর।

কিবরিয়া সাহেব বললেন–মানে দীর্ঘ একটা বছর ধরে আমরা নানাভাবে সন্ধান চালিয়েও কোন ক্লু আবিস্কারে সক্ষম হতে পারলাম না এই খোন্দকার বাড়ির রহস্য উদঘাটন ব্যাপারে, তাই বলছিলাম……

হাঁ, তা অবাধ্য সত্য ইন্সপেক্টার সাহেব, খোন্দকার বাড়ির রহস্য অত্যন্ত গভীর জলের মাছের মত হদিসহীন। কথাটা বললো বনহুর।

মিঃ আহমদ আলী বললেন–আপনি তো খোন্দকার নেহালের অবস্থা দেখেননি। আসুন দেখবেন, আসুন ও ঘরে আছেন তিনি।

জামাল সাহেব ব্যথাভরা কণ্ঠে বললেন–হা, এসেছেন যখন তখন নেহালকে একবার স্বচক্ষে দেখে যান এবং সব কথা জেনে যান, কারণ আপনারা সবাই মিলে খোন্দকার বাড়ির গভীর রহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছেন কিনা। আসুন।

বনহুর, পুলিশ ইন্সপেক্টার ও মিঃ আহমদ আলী সহ নেহালকে যে কক্ষে রাখা হয়েছিলো সেই কক্ষের দিকে পা বাড়ান জামাল সাহেব।

আবদুল্লাহ সাহেব তাদেরকে অনুসরণ করেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তে পাশের একটা ছোট্ট কামরা থেকে কামালের অট্টহাসির শব্দ শোনা যায়।

জামাল সাহেব বলেন–পাগলটা দেখুন কেমন হাসছে। ভাইকে কোনো আততায়ী ছুরিকাঘাত করেছে অথচ ওর কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

মিঃ কিবরিয়া বললেন–পাগল–পাগলই বটে, তার কোনো সম্বিৎ আছে নাকি!

বললো বনহুর–পাগলের পাগলামির পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ লুকানো আছে ইন্সপেক্টর, নইলে সে অমন করে হাসতে না কাঁদতো না।

নেহালকে পরীক্ষা করে দেখে বনহুর ভালভাবে। আঘাতটা গভীর না হলেও মারাত্মক বটে, কারণ ক্ষত দিয়ে অনেক রক্তপাত হয়েছে। এখনও নেহালের সংজ্ঞা ফিরে আসেনি তবে ফিরতে বেশি বিলম্ব হবে না।

কাল ভোরে আবার আসবো, বলে বনহুর সবার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

ঐ মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি সরে গেলো খোন্দকার বাড়ির কক্ষের আড়ালে।

এত রাতে বনহুর নিজের ভাড়াটে বাসায় না গিয়ে রীনার বাসার অভিমুখে রওনা দিলো।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়েই শুনতে পেলো বনহুর রীনার গলার আওয়াজ।

রীনা বলছে–ভুলুকে সময়মত পাওয়া যায় না আজকাল, সে বড় বেয়াড়া হয়ে গেছে।

রহমানের গলা শোনা গেলো–আমি প্রথমেই বলেছিলাম এত বোকা লোক দিয়ে কাজ হবে না। ঠিক সময়মত ওকে পাওয়া যায় না বা কাজ হয় না।

কি করবো বলুন, সব সময় একটা লোকের খুব দরকার এবং সে কারণেই আমি ভুলুকে রেখেছি। বেশি মাইনে দিতে হয় না। এছাড়া কোনো বদমাইশি নেই ওর মনে,

কিন্তু ওর যে নেশা করার অভ্যাস আছে তা আপনি জানেন না মিস রীনা।

নেশা!

হা। আর সেই কারণেই রাতে ওকে বেশি সময় বাড়িতে পান না।

সত্যি কিন্তু……

রাতের জন্যই ওকে বেশি দরকার বলে আপনি ওকে রেখেছেন অথচ আজকাল রাতে ও মোটেই বাসায় থাকে না।

আমিও তাই লক্ষ্য করেছি, ও যায় কোথায়?

ঐ তো বললাম নেশা করতে! আমি শুনেছি সে প্রতি রাতে খোন্দকার বাড়িতে যায় এবং ও বাড়ির চাকর রবিউল্লার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। দুজনে মিলে নেশা করে।

রীনার গলা–আমি ওকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করবো মানে বাদ দেবো বুঝলেন?

রহমান বললো–তাই ভাল, ওকে নিয়ে আর পারা যায় না। এই আছে এই নেই, সব সময় কি চাকর–বাকরকে ডেকে কাজ করানো চলে।

কিন্তু

কোনো কিন্তু নেই, আমি একটা ভালো চাকর যোগাড় করবো, যাকে দিয়ে রাতে পাহারার কাজ চলবে।

সিঁড়ি বেয়ে বনহুর যখন উপরে এলো তখন রীনা এবং রহমান উঠে দাঁড়ালো।

রীনা বললো–ভুলুকে নিয়ে আর পারছি না আলম সাহেব, ওকে কাল ভোরে বিদেয় করব।

বনহুর সিঁড়ির ধাপে উঠতে উঠতে সব কথা শুনতে পেয়েছিলো, তাই বললো সে–ভুলুকে প্রথম থেকেই আমার কেমন যেন সন্দেহ লাগছিলো। তাই ওকে বিদেয় করে দিয়ে আরেকটা ভাল লোক রাখা উচিত।

হাঁ, তাই করব! বললো মিস রীনা।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো রহমান, তুমি একটা ভাল এবং সৎলোককে দেখে শুনে রাখবে যাতে রাতে সে বাড়ির বাইরে না যায়। হা, ভালভাবে দেখেশুনে নেবে যার কোনো নেশা নেই।

আচ্ছা, তাই করবো। বললো রহমান।

এদিকে তখন রাত ভোর হয়ে এসেছে।

রহমান বেরিয়ে যায় নিজের কক্ষের দিকে।

বনহুর বললো–মিস রীনা, কেমন ছিলেন?

ভালো না, সব সময় কেমন যেন আতঙ্ক নিয়ে কাটাতে হয়। এ বাড়ি আমার মোটেই ভাল লাগে না।

লাগবে! ফাংহায় এমন বাড়ি কমই দেখা যায়। কত সুন্দর কক্ষগুলো, বেলকুনিতে দাঁড়ালে সমস্ত ফাংহা শহর দৃষ্টিতে ভেসে উঠে। রাতে আরও সুন্দর লাগে শহরের বাড়িগুলো, যেন ছবির মত। মিস রীনা, এ বাড়িখানাই আপনার যোগ্য বাড়ি।

কিন্তু ঐ খোন্দকার বাড়ির অভিশাপ আমার বাড়িতেও এসে লেগেছে। আমি বড় ভয় পাই যখন আমার বাড়ির ছাদে কিংবা জানালার পাশে ছায়ামূর্তি দেখতে পাই কিংবা তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই……।

মিস রীনা, খোকার বাড়ি অভিশাপমুক্ত হলেই এ বাড়ির সব ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে। তখন দেখবেন এ বাড়িখানা আপনার কাছে হয়ে উঠেছে স্বর্গীয়।

জানি না কবে সেদিন আসবে।

আসবে।

সত্যি আসবে?

হাঁ, মিস রীনা! চলুন বাইরে ছাদে গিয়ে দাঁড়াই। ভোর হয়ে আসছে প্রকৃতির দৃশ্য উপভোগ করা যাবে।

বসুন, আরও একটু ফর্সা হোক অন্ধকারটা…….।

ভয় নেই মিস রীনা, ছায়ামূর্তি এখন আসবে না।

না, সে ভয় অবশ্য এখন নেই আমার মনে, কারণ আপনি পাশে থাকলে ছায়ামূর্তি পাশে এলেও ভয় পাবো না।

সত্যি? হেসে বললো বনহুর।

রহমান গিয়ে বয়কে বলেছিলো, বয় গরম চা নিয়ে হাজির হলো।

বনহুর চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে ওদিকের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ভোলা জানালা দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় দূরে অনেক দূরে। ফাংহার বাড়িগুলো তখনও ঘুমন্তপুরীর মত মনে হচ্ছে।

বনহুর ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তাকিয়ে রইলো ঘুমন্ত ফাংহার দিকে।

রীনা কখন এসে দাঁড়িয়েছে বনহুরের পাশে, সে বলে এবার–আপনি চলে যাবার পর মোটেই ভাল লাগেনি। জানি না কেন আমার এমন হয়?

বনহুর ফিরে তাকায়, রীনার মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

রীনা বলে উঠে আবার–কি দেখছেন?

মিস রীনা–জানি আমি এখানে থাকলে আপনি খুশি হন কিন্তু আপনি জানেন না তা কোনদিনই সম্ভব নয়, কারণ আমার বহু কাজ।

তাই বলে চলে যান আর আসবার নামটি করেন না–কি এত কাজ বলুন তো?

হাসলো বনহুর–শুনতে চান?

অসুবিধা থাকলে শুনতে চাই না।

বনহুর খালি চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে টেবিলে, তারপর আসন গ্রহণ করে বলে বসুন।

রীনা বসে তার পাশের আসনে।

বনহুর লুসির কাহিনীটা বলে রীনার কাছে, তারপর বলে ফুল্লরার চুরি যাবার কথা।

শুনে রীনাও ব্যথিত হয়।

বনহুর বলে–ফুল্লরার নিরুদ্দেশ আমাকে যেভাবে ভাবিয়ে তুলেছে তাতে আমি মুষড়ে পড়েছি মিস রীনা, কারণ আমারই জন্য আমার স্ত্রীর বান্ধবী তার কন্যাকে হারিয়েছে।

আপনার স্ত্রী! মিঃ আলম, আপনি কি বিবাহিতা

কেন, রহমান বলেনি?

না, আমি তাকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি।

মিস রীনা, আমার স্ত্রী আছে, সন্তান আছে.......

সত্যি?

হাঁ।

কিন্তু আপনিও তো কোনোদিন বলেননি?

কোনো প্রয়োজন মনে করিনি তাই।

রীনা কোনো কথা বলে না, মুখখানা তার ম্লান হয়ে আসে ধীরে ধীরে।

বনহুর সিগারেটের ধোয়ার ফাঁকে তাকায় রীনার নিষ্প্রভ মুখখানার দিকে। সত্যি মায়া হয়, রীনা এতদিন ভেবে এসেছে মিঃ আলম অবিবাহিত। হয়তো সে তাকে ভালবাসবে এবং নিজের পাশে স্থান দেবে। মিঃ আলমের সান্নিধ্য পাবার জন্য তাই উনাখ ছিলো মিস রীনা। আজ ওর মনে ভীষণ আঘাত লেগেছে। মিঃ আলমকে রীনা একান্ত আপন করে পাবে না তা বুঝতে পারে আজ সে, তাই তার মুখখানা মান হয়ে আসে।

বনহুর ওকে খুশি করার জন্য বলে–মিস রীনা, আজ তৈরি থাকবেন, ঠিক বেলা চারটায় বেড়াতে যাবো।

কোথায়?

অজানা কোনো জায়গায়।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ। তৈরি থাকবেন, আমি আসবো। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে বনহুর– এখন তাহলে চলি?

রহমান এসে দাঁড়ালো–এক্ষুণি না গেলে কি চলছে না।

না রহমান, কিছু কাজ আছে।

বনহুর বিদায় গ্রহণ করে।

রীনা প্রতীক্ষা করছে কখন আসবেন মিঃ আলম। কতদিন পর আজ সুন্দর করে সাজলো রীনা। কপালে টিপ পরলো, সুন্দর হাল্কা নীল রঙের একটা শাড়ি পরলো সে–আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজকে ভালভাবে দেখতে থাকে।

এমন সময় ভুলু এসে দাঁড়ায়–আপামনি।

রাগতভাবে ফিরে তাকায় রীনা, তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে–আজ থেকে তোর কাজ শেষ।

কাজ শেষ?

হ্যাঁ।

তাহলে ছায়ামূর্তি আর আসবে না আপামনি? সেই যে নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ....

চুপ কর হতভাগা, চুপ করে থাক।

এই তো আপনি বললেন আমার কাজ শেষ।

শেষ মানে তোমাকে আর রাখবো না।

ও, তাই বলেন কিন্তু কেন আপামনি?

সমস্ত রাত কোথায় থাকি তুই?

কেন, পাহারায় থাকি

আবার মিথ্যা কথা?

মিথ্যা বলবো কেন, সত্যি বলছি আপামনি।

বল আজ রাত কোথায় ছিলি?

ঐ তো বললাম পাহারায়। আপামনি, আজ যা দেখলাম তা শুনলে আপনি ভয়ে শিউরে উঠবেন।

তাই সারারাত কোথায় ছিলি, এ বাড়িতে না খোন্দকার বাড়িতে।

দু'বাড়িতেই ছিলাম....

তার মানে?

মানে এ বাড়ি থেকে ছায়ামূর্তি যখন রাতের অন্ধকারে খোন্দকার বাড়ির দিকে গেলো তখন আমি তাকে অনুসরণ চরে চললাম।

বলিস কি?

হাঁ আপামনি।

তারপর?

আমি গোড়া থেকে বলবো?

তাই বল?

আপামনি, আমি খেয়ে দেয়ে বোজ শোবার আগে একটু খোন্দকার বাড়ি যাই.......কেন যাই জিজ্ঞাসা করলে লজ্জা পাবো কিন্তু।

জিজ্ঞাসা না করলেও আমি ঠিক জানি তুই কেন যাস। যাক সে কথা, এবার বল কি দেখেছিস আজ রাতে?

কাউকে বলবেন না তো?

না, বলবো না।

ভয় পাবেন না তো?

না, তুই বল।

আমি খোন্দকার বাড়ি যাবো বলে চুপি চুপি বাড়ির গেটের দিকে এগুচ্ছিলাম। জানি শব্দ হলেই আপনি জেগে উঠে আমাকে ডাকাডাকি শুরু করবেন।

তাই চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে..

রোজ যাই আপামনি।

অত ভূমিকা রেখে ঝটপট বল।

হাঁ, তাই তো বলবো, তারপর যখন কিছুটা এগিয়েছি। .......তখন দেখলাম দোতলাল ছাদে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। ভাবলাম দেখবো ছায়ামূর্তি কি করে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি দেখছি।

তারপর?

ছায়ামূর্তি নেমে এলো নিচে, সিঁড়ির ধাপে তার পায়ের কোনো শব্দ হলো না, সেটা বড় আশ্চর্য লাগলো, আমি তাই ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখলাম ছায়ামূর্তি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে কিন্তু সিঁড়ির ধাপে তার পা নেই, পা শূন্যে, প্রায় চার আংগুল উঁচু দিয়ে হাঁটছে লোকটা।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে রীনার মুখমন্ডল, ঢোক গিলে বললো–তারপর?

ছায়ামূর্তিটা এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা খোন্দকার বাড়ির দিকে এগুলো। আমি তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম, আমাকে যেন সে দেখতে না পায় সেজন্য লুকিয়ে লুকিয়ে এগুতে থাকলাম ছায়ামূর্তি সোজা খোন্দকার বাড়ির ফটক পেরিয়ে চলে গেলো বাগানবাড়ির দিকে। তারপর সে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেলো। তাকে আর দেখা গেলো না। হঠাৎ বাগানবাড়ির গাছপালার মধ্যে জ্বলে

উঠলো একটা আলো, প্রথমে আলোটা এদিক ওদিক নেচে বেড়াতে লাগলো, তারপর আলোটা ধীরে ধীরে লালচে ভয়াল এক ধরনের আলোতে পরিণত হলো……

সত্যি বলছিস ভুলু?

হাঁ আপামনি।

তারপর কি দেখলি?

দেখলাম আলোকরশ্মি মিশে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের পানিতে শোনা গোলা তর্জন গর্জন…

তারপর কি দেখলি?

আড়ালে আত্মগোপন করে সব দেখছি, দেখলাম পুকুরের পানি থেকে উঠে এলো একটা ছায়ামূর্তি। দেখলাম সেই লোকটা পুকুরের পানি থেকে উঠে সোজা সে চলে গেলো খোন্দকার বাড়ির মধ্যে…..তারপর হঠাৎ একটা চিৎকারের শব্দ। আপামনি, আমি আর রবি উল্লা গিয়ে দেখি খোন্দকার বাড়ির উঠানে পড়ে আছে ছোট খোন্দকার নেহাল……

সত্যি?

হাঁ, রক্তে ভেসে যাচ্ছে খোন্দকার নেহালের বুকের পাশটা।

তারপর?

তারপর পুলিশ এলো, ডাক্তার এলো……

এবার বুঝেছি, তুই এসব দেখলি সমস্ত রাত ধরে, তাই না?

হাঁ আপামনি।

তারপর?

রবিউল্লার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙতেই ছুটে আসছি। আপামনি, আপনি বলছেন আজ থেকে কাজ শেষ, তাহলে আমার ছুটি? আমি চলে যাবো?

রীনা ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললো–ঠাট্টা করে বললাম তাই চলে যাবি ভুলু?

আপনি যে বললেন?

এমনি বললাম।

তাহলে যাব না?

না, কাজ করগে যা।

আচ্ছা আপামনি, তাই যাচ্ছি।

ভুলু বেরিয়ে গেলো।

রীনা ভাবছে ভুলুর কথাগুলো, কি সাংঘাতিক ব্যাপার! তাদের বাড়ির ছাদে ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলো, তারপর সে চলে গেলো খোন্দকার বাড়ির দিকে, তারপর বাগানে আলোর গোলক নেচে বেড়ালো, তারপর পুকুরের পাড়ে.......কি ভয়ানক রহস্য.......না না,. এ বাড়িতে আর নয়, আজ মিঃ আলম এলে এ বাড়ি ছাড়বার জন্য তাকে খুব করে বলতে হবে। এমন ভুতুড়ে বাড়িতে থাকা যায় না।

এমন সময় রহমান প্রবেশ করলো সেই কক্ষে। রীনাকে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে দেখে বললো রহমান মিস রীনা, এভাবে চুপচাপ বসে আছেন কেন?

জানেন কি ভীষণ কান্ড.......

হাঁ, সব শুনলাম ভুলুর মুখে।

আমার কিন্তু এ বাড়িতে মোটেই ভাল লাগছে না। আমাদের বাড়ির ছাদে নিশ্চয়ই কোনো অশরীরী আত্না লুকিয়ে আছে এবং সেই এসব কান্ড ঘটাচ্ছে।

রহমান বললো–মিস রীনা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মিঃ আলম যখন সময়মত এসেছেন, তিনি সব রহস্য উদঘাটন করবেন বলে আশা রাখি।

কিন্তু আজ পর্যন্তও কোনো হদিস তিনি খুঁজে পেলেন না। রহমান সাহেব, আজ তিনি আসবেন, সব কথা তাকে জানাবো। আমার কিন্তু বড় ভয় করছে…

ব্যাপার কি রহমান? কথাটা বলতে বলতে কক্ষমধ্যে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

রীনা উঠে দাঁড়ালো, রহমান দাঁড়িয়েই ছিলো, সে রীনার পেছনে ছিলো তাই সর্দারকে ইংগিতে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো রীনা–মিঃ আলম, আপনি এসেছেন, যাক বাঁচলাম।

বনহুর বললো–তার মানে?

মানে বসুন, অনেক কথা আছে।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো, সিগারেট ধরালো সে আনমনে।

রীনা ভুলুর বর্ণনা বনহুর মানে মিঃ আলমকে বলে শোনালো।

সব শুনে বনহুরের মুখে গভীর একটা চিন্তারেখা ফুটে উঠলো, কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললো, আমি পূর্বেই বুঝতে পেরেছি, এ বাড়িতেও খোন্দকার বাড়ির ছোঁয়া লেগেছে। যাক, আমি এ ব্যাপার নিয়ে ফাংহা পুলিশ প্রধানের সঙ্গে আলাপ করবো। চলুন বেড়িয়ে আসি, রহমান, তুমি গাড়ি বের করতে বল।

বনহুর রীনার সুবিধার্থে একটা কুইন কার কিনে দিয়েছিলো, যখন যেখানে যাবার প্রয়োজন যেতে রীনা এবং রহমান।

ড্রাইভার ছিলো না। প্রয়োজনবোধে রহমান নিজে ড্রাইভ করতো। রীনাও গাড়ি চালনা জানতো তাই কোনো অসুবিধা হতো না।

রহমান চলে গেলো।

বনহুর বললো–শুনলাম ভুলুকে আপনি বাদ দিচ্ছেন, মানে বিদায় করছেন?

এ কথা কে বললো আপনাকে?

ভুলুই বলেছে।

ভুলু?

হাঁ।

কোথায় সে?

নিচে সিঁড়ির মুখে মুখভার করে দাঁড়িয়েছিলো, আমাকে দেখে বললো–সাহেব, এবার আমার ছুটি?

আমি বললাম, তার মানে?

ভুলু বললো–আপামনি আমাকে বিদায় দিয়েছেন মানে আর রাখবেন না। তারপর কি যেন ভেবে বললো–ছাড়তে পারবেন না, কারণ আমি না থাকলে কবে আপামনিকে ছায়ামূর্তি চুরি করে নিয়ে যেতো... কথাটা বলে হাসতে লাগলো বনহুর তারপর বললো–চলুন এবার উঠা যাক! হাঁ, আমি ভুলুকে বলেছি, সে যেন ঠিকমত সবদিকে লক্ষ্য রাখে।

কোথায় ভুলু?

আমি একটু কাজে বাইরে পাঠিয়েছি তবে সকাল সকাল ফিরে আসতে বলেছি ওকে।

কথাগুলো বলতে বলতে বনহুর আর রীনা নেমে আসে নিচে।

বনহুর গাড়ির পাশে আসতেই রহমান গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

রীনা বসে পিছন আসনে, আর বনহুর ড্রাইভিং সিটে গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে বলে বনহুর–বলুন কোথায় যাবেন?

সত্যি কতদিন বাইরে বের হই না। আজ ভাল লাগছে আমার!

কোথায় যাবেন তা তো বললেন না?

নতুন কোনো জায়গায় চলুন।

বেশ, তাই হবে।

অনাবিল এক আনন্দে ভরে উঠে রীনার মন। এত খুশি বুঝি আর কোনোদিন লাগেনি তার। পথের দু'ধারে দৃশ্যগুলো আজ বড় মনোরম লাগছে তার চোখে। আকাশে উড়ে চলা বলাকার মত তার মন আজ ভেসে বেড়াতে চায় হালকা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু যখনই মনে পড়লো যাকে ঘিরে তার মন আজ আনন্দে আত্নহারা, যাকে নিয়ে সে স্বপ্নজাল বুনে চলেছে, সে কোনোদিন তার একান্ত আপন হবে না। তাকে কোনোদিন পাওয়া যাবে না, সব তার কল্পনারই থেকে যাবে......দুচোখ ভরে উঠলো তার অশ্রুতে। এ জীবন দিয়ে কি হবে তাহলে, এ পৃথিবীতে তার আপনজন বলতে কেই বা আছে। যারা আছে তারা তাকে মন থেকে মুছে ফেলেছে, বিসর্জন দিয়েছে চিরদিনের মত। মিঃ আলমও যদি তাকে ত্যাগ করে চলে যান তাহলে কোথায় যাবে সে......তার জীবনটাকে হিরন্ময় নিঃশেষ করে দিয়েছে.......ব্যর্থ করে দিয়েছে শয়তানটা......একমাত্র ছোট বোন, সে এখন কোথায় কে জানে....

হঠাৎ রীনার চিন্তাধারায় বাধা পড়ে, বলে বনহুর–দেখুন তো আমরা কোথায় এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা থেমে পড়লো।

রীনা বললো–আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না।

ভাল করে তাকিয়ে দেখুন দেখি?

রীনা তাকালো ভাল করে।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো নেমে আসুন মিস রীনা।

রীনা নামলো।

বনহুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলোজায়গাটা চিনতে পারছেন না মিস রীনা, ভাল করে খেয়াল করুন

হাঁ, মনে পড়ছে, এই ডাকবাংলোয় আপনি থাকতেন। আপনি প্রথম আমাকে এখানেই আশ্রয় দিয়েছিলেন।

হাঁ ঠিক বলেছেন মিস রীনা। আসুন, আজ আপনাকে আরও একটা জিনিস দেখাবো।

রীনা বনহুরকে অনুসরণ করলো।

ডাকবাংলোর দিকে এগিয়ে চললো বনহুর, অদূরে তাদের গাড়িখানা অপেক্ষা করতে লাগলো।

ডাকবাংলোর সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই নজরে পড়লো বৃদ্ধ মালি বাগানে বসে বসে ঘাস তুলছে খুরপি দিয়ে।

বনহুর ডাকলো–এই শোনো।

বৃদ্ধ মালি এগিয়ে এলো, ভাল করে তাকিয়ে খুশিভরা কণ্ঠে বললো–বাবুজী তুই?

হাঁ, এলাম তোমাকে দেখতে।

বাবুজী।

কেমন আছো তুমি?

খুব ভাল আছি বাবুজী।

তাই নাকি, তুমি খুব ভাল আছো?

হাঁ বাবুজী; আমার ঝুমাকে আমি খুঁজে পেয়েছি।

ঝুমা! অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর।

হাঁ বাবুজী, ঝুমা হামার ঘুমিয়ে আছে।

বলো কি,

দেখবি বাবু, চল হামার সঙ্গে।

বনহুর রীনাকে বললো–ডাকবাংলো মালি। এর মেয়ের নাম ছিলো ঝুমা।

শুনলাম সে নাকি.......

বনহুর ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বললো–চলুন দেখা যাক।

ঝুমার বাবা আগে আগে চললো আর পিছনে চললে বনহুর আর রীনা।

পাহাড়িয়া পথ।

মাঝে মাঝে উঁচু টিলা।

বাংলো থেকে কিছুটা এগুতেই মালির বাড়ি নজরে পড়লো।

বনহুর রীনাকে বললো–এটাই ঝুমার বাবার বাড়ি। বাপ আর মেয়ে ও বাড়িতেই থাকতো।

বাবুজী, এখনও হামি আর বেটি থাকি। আমার কুমারকে ছাড়া হামি থাকতে পারি কোনোদিন বাবুজী, ঝুমা হারিয়ে গিয়েছিলো, তাকে খুঁজিয়ে পেয়েছি.....

ঝুমার বাবার কথাগুলো বনহুরের কাছে হেয়ালিপূর্ণ লাগছিলো, কেমন যেন ছন্নছাড়া ওর চেহারা মুখে দাড়ি, চোখ ঘোলাটে উদাস।

বাড়ির কাছে এসেও বাড়ির মধ্যে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, ঝুমা কি চুপ থাকার মেয়ে, এতক্ষণে ছুটে বেরিয়ে আসতো সে কিন্তু কেউ এলো না।

ঝুমার বাবা বনহুর আর রীনাকে নিয়ে উঠানে এলো, ডাকলো–বেটী ঝুমা, ঝুমা রে.....

কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না।

ঝুমার বাবা বললো–জানিস বাবু, ঝুমার বড় অভিমানিনী, তাই সহজে কথা বলে না।

বনহুর কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে মালির মুখের দিকে।

মালি বলে–দেখছি না বাবুজী সারা বাড়ি কেমন জঙ্গল হয়ে গেছে, তবু ঝুমা সাফ করে না। শুয়ে শুয়ে থাকবে....শুধু ঘুমাবে ও....

বনহুর আর রীনা দেখছে সমস্ত উঠানে ঘাস জন্মেছে। আগাছা আর জঙ্গলে ভরে উঠেছে চারিদিক। এ বাড়িতে মানুষ বাস করে নাকি!

ঝুমার বাবা ততক্ষণে বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়েছে। বললো–আয় বাবুজী।

বনহুর আর রীনা প্রবেশ করলো ঝুমার বাবার পিছনে পিছনে কুঁড়ে ঘরের মধ্যে।

ঘরের চাল ভেঙে গেছে, চালের ফাঁকে সূর্যের আলো প্রবেশ করেছে ঘরের ভিতরে।

ঝুমার বাবা বাঁশের মাচাঙ্গে কাপড় ঢাকা দেওয়া কাউকে দেখিয়ে বললো– বাবুজী, ঐ তো ঝুমা ঘুমিয়ে আছে। আয় বাবুজী, দেখবি আয়......মালি মাচাঙ্গের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে কাপড়খানা সরিয়ে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে রীনা ভয়ার্ত চিৎকার করে দু হাতে চোখ ডেকে ফেললো।

বনহুর দেখলো বাশের মাচাঙ্গে শোয়ানো আছে একা কঙ্কাল। বুঝতে পারলো এ কঙ্কাল ঝুমার ছাড়া আর কারও নয়। বনহুরের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো ঝুমার মুখখানা ভেসে উঠলো তার চোখের সম্মুখে

বনহুরের দৃষ্টি ফিরে এলো ঝুমার মুখে। কারণ সে ঝুমার কঙ্কাল দেখামাত্র চমকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিলো অন্য দিকে। ঝুমার হাতে নজর ফেলতেই বনহুর দেখলো কঙ্কালের হাতের আংগুলে তার সেই আংটি। এ কঙ্কাল যে ঝুমার তাতে সন্দেহ নেই।

মালি ঝুমার গলায় পরানো রূপার চেনে একটি তাবিজ তুলে ধরে বললোবাবুজী, এই তাবিজ ওর মায়ের ছিলো, হামি সখ করে ওকে দিয়েছিলাম। তাই ঝুমা আজও ওটা খুলে ফেলেনি। জানিস বাবুজী মাকে আমি কত খুজিয়েছি পাইনি, খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি, তারপর–তারপর একদিন ডাকবাংলোর আলমারির মধ্যে মাকে আমি পেয়েছি....মার গলার তাবিজ দেখে আমি মাকে চিনতে পেরেছি।

আর আমি ওকে চিনলাম ওর আংগুলে ঐ আংটি দেখে, মিস রীনা। ওর হাতের আংগুলে ওটা আমার আংটি, আমি ওকে দিয়েছিলাম কোনো কারণে খুশি হয়ে।

রীনার চোখ দুটো ছলছল করছিলো।

ঝুমার বাবা তখন হেসে উঠে জানিস বাবুজী, মা হামার ভীষণ অভিমানিনী। তাই সব সময় ঘুমিয়ে থাকে, আমি নিজে পাক করে খাই তবু ওকে জাগাই না। মা হামার ঘুমাক, আরও ঘুমাক……

আনমনা হয়ে যায় ঝুমার বাবা।

বনহুর বলে উঠে–দুঃখ করো না, তোমার ঝুমা শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। ওকে জাগাতে চেষ্টা করো না। এই নাও কিছু টাকা……বনহুর পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে ঝুমার বাবার হাতে গুঁজে দেয়–তোমাকে আর কাজ করতে হবে না। এ টাকা ব্যাংকে রেখো, যতদিন বাঁচবে প্রয়োজনমত উঠিয়ে নিয়ে খরচ করবে।

বাবুজী! বাবুজী তোর কত দয়া।

থাকো, এবার আমরা চলি! বনহুর কথাগুলো বলে কাপড় ঢাকা ঝুমার কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

ঝুমার বাবা দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর ও রীনা এগিয়ে চললো ডাকবাংলোর দিকে।

গাড়িতে বসে বললো বনহুর জীবনের প্রথম ধাপে পা দিয়েই ঝুমা চিরবিদায় নিয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে। সত্যি ও জন্য বড় দুঃখ হয়….

রীনা বললো–ঝুমাকে আমি দেখিনি তবুও কেন যেন ওর কঙ্কাল দেখে আমার খুব কান্না পাচ্ছিলো। রহমান সাহেবের কাছে আমি সব শুনেছি হয়তো তাই ওর জন্য এত ব্যথা পেলাম।

মিস রীনা, আপনি ব্যথা পাবেন জানলে এখানে আপনাকে আনতাম না।

কিন্তু এসে আমি একটা সান্ত্বনা পেলাম মিঃ আলম। ভেবেছিলাম আমিই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি অসহায়–কিন্তু আমার চেয়েও অসহায় আছে সে ঐ ঝুমার বাবা! একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো রীনা।

গাড়ি তখন ছুটতে শুরু করেছে।

*

রীনা বললো–ভুলু, কোথায় গিয়েছিলি তুই?

পুলিশ অফিসে।

পুলিশ অফিসে গিয়েছিলি তুই, বলিস কি ভুলু?

হাঁ আপামনি। জানেন, আজ খোন্দকার বাড়ির সব রহস্য ভেঙে যাবে।

তার মানে?

মানে সব দেখতে পাবেন। আজ অমাবস্যা রাত, তাই না আপামনি?

হাঁ।

যাই, খুব করে একটু ঘুমিয়ে নেই, রাতে আবার জাগতে হবে যে……

যা ঘুমোগে। বললো রীনা।

ভুলু চলে গেলো।

সমস্ত দিন ওকে কেউ বিরক্ত করলো না, খুব করে ঘুমালো ভুলু তার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে।

রীনা আর রহমান ওকে বিরক্ত করলো না। যদিও ওর কথা তেমন বিশ্বাস হয়নি, কারণ বড় বড় গোয়েন্দা পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেছে খোন্দকার বাড়ির রহস্য উদঘাটন ব্যাপারে, আর ভুলু কিনা বলে খোন্দকার বাড়ির রহস্য আজ উদঘাটিত হবে।

রীনা কিছু খেয়াল না করলেও রহমান ভুলুর কথাটা নিয়ে ভাবলো, সে গোপনে খেয়াল রাখলো ভুলুর উপর।

*

রাত বাড়ছে।

সমস্ত পৃথিবী ঘুমের আবেশে ঢলে পড়েছে।

একদল পুলিশ অন্ধকারে আত্নগোপন করে লুকিয়ে রইলো খোন্দকার বাড়ির আশেপাশে।

প্রতিদিনের মত ভুলু এসে হাজির হলো রবিউল্লার ঘরে। চললো গাঁজা টানা তারপর আবোল তাবোল কথাবার্তা।

দূরে কোনো মন্দির বা গীর্জায় রাত তিনটা বাজার শব্দ হলো।

খোন্দকার বাড়ি নীরব নিঝুম।

একটা নীলাভ আলো গোলক জ্বলে উঠলো খোন্দকার বাড়ির বাগানের মধ্যে। গোলকটা নেচে নেচে ঘুরলো খানিকক্ষণ।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি রীনার বাড়ির ছাদ থেকে নেমে এলো নিচে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে খোন্দকার বাড়ির দিকে এগুলো। ঠিক ঐ দন্ডে পুকুরের পানিতে ভীষণ আলোড়ন জাগলো। ভেসে উঠলো একটা বাক্স!

ততক্ষণে খোন্দকার বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে সেই ছায়ামূর্তি।

সে যখন বেরিয়ে এলো খোন্দকার বাড়ির ভিতর থেকে তখন তার কাঁধে একটা লোক আছে বলে মনে হলো। লোকটার হাত-পা–মুখ বাঁধা আছে, তাই সে নড়তে বা চিৎকার করতে পারছে না।

ভীষণ চেহারার লোকটা মানে সেই ছায়ামূর্তি আলগোছে এগিয়ে চললো পুকুরপাড়ের দিকে।

তার পিছনে একজন আলখেল্লাধারী ব্যক্তি এগিয়ে যাচ্ছে।

বোঝা গেলো আলখেল্লাধারীই ছায়ামূর্তিটাকে নির্দেশ দিচ্ছে বা পরিচালনা করছে।

হাত-পা বাঁধা লোকটাকে কাঁধে নিয়ে ছায়ামূর্তি ও আলখেল্লাধারী ঠিক পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়ালো।

যে বাক্সটা পুকুরের মধ্যে থেকে ভেসে উঠেছিলো সেটা এখন ঘাটে ভিড়েছে।

রাতের অন্ধকারে খোন্দকার বাড়িতে অমাবস্যা রাতে চললো এক রহস্যময় কার্যকলাপ। ঘাটে এসে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি এবং তার পিছনে আলখেল্লাধারী।

পুকুরের পানিতে তখনও একটা আলোড়ন চলেছে। ওদিকে বাগানবাড়ির লালচে আলো ক্রমান্বয়ে ভয়াল আলোতে পরিণত হয়েছে।

হাত-পা বাঁধা লোকটাকে যে মুহূর্তে ভাসমান বাক্সের মধ্যে তুলতে যাবে, অমনি ভুলু শিষ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে আড়াল থেকে মিঃ কিবরিয়া, মিঃ আহমদ আলী এবং কয়েকজন সশস্ত্র অস্ত্রধারী পুলিশ ঘিরে ফেললো ছায়ামূর্তি ও আলখেল্লাধারী লোকটাকে।

সবাই অস্ত্র উদ্যত করে ধরেছে।

ভুলুর হাতে আজ রিভলভার, সে রিভলভার চেপে ধরেছে আলখেল্লাধারীর পাজরে। যেন আলখেল্লাধারী একচুল নড়তে না পারে।

ততক্ষণে মিঃ কিবরিয়া এবং আহমদ আলী ও পুলিশ বাহিনী তাদের উদ্যত অস্ত্র নিয়ে ঘিরে ফেলেছে।

ভুলু বলে উঠে–খবরদার, একচুল নড়বেন না। নড়লেই মরবেন। ইন্সপেক্টর, আপনারা পুকুরের পানিতে ভাসমান বাক্সটার দিকে খেয়াল রাখুন, ওটা যেন……

মিঃ কিবরিয়া বলে উঠলেন, কিন্তু ভাসমান বাক্স তো উধাও হয়েছে।

টর্চের আলো ফেললেন আহমদ আলী পুকুরের পানিতে। সেকি তর্জন গর্জন পানির বুকে শুরু হয়েছে।

বলল ভুলু–শয়তান ছায়ামূর্তি ভেগেছে।

সবাই দেখলো হাত-পা বাঁধা অবস্থা পড়ে আছে সেই ব্যক্তি যাকে বাক্সে তুলে নিয়ে পুকুরে ডুব মারতে চেয়েছিলো।

হৈ হুল্লোড় শুনে বেরিয়ে এলেন জামাল সাহেবা, পিছনে লণ্ঠন হাতে চাকর রবিউল্লা। আরও কয়েকজন এসে জড়ো হলো পুকুরপাড়ে।

ভুলু তখন রিভলভার আলখেল্লাধারীর পাঁজরে চেপে ধরে আছে।

পুলিশরা ঘিরে আছে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে।

একচুল নড়বার ক্ষমতা নেই কারও।

আলো আনতেই সবাই অবাক হলো, দেখলে হাত-পা এবং মুখ বাঁধা অবস্থায় পুকুরপাড়ের ঘাসের মধ্যে পড়ে আছে কামাল।

দ্রুতহস্তে জামাল সাহেব আর রবিউল্লা কামালের হাত-পা এবং মুখের বাঁধন খুলে দিলেন।

কামাল হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, তারপর চিৎকার করে বড় ভাই খোন্দকার খবির সাহেবের নাম ধরে ডাকতে লাগলো।

মিঃ কিবরিয়া এবং মিঃ আহমদ আলী কামালকে সন্দেহ করে আসছেন প্রথম থেকে। তারা ভেবেছিলেন খবির সাহেবকে উধাও করার ব্যাপারে কামালই ষড়যন্ত্রকারী। সে–ই খোন্দকার বাড়ির অশান্তির কারণ। কিন্তু আজ তাদের যে ভুল ভেঙে গেলো। কামালকে আজ উধাও করা হচ্ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এই ষড়যন্ত্রকারী যার চক্রান্তে খোন্দকার বাড়ি আজ শান্তিতে ভরে উঠেছে।

বললেন মিঃ কিবরিয়া–আমরা কামাল সাহেবকে সন্দেহ করেছিলাম, এখন দেখছি.......

একটু পরই জানতে পারবেন কে সেই ষড়যন্ত্রকারী যার চক্রান্তে খোন্দকারবাড়ি আজ অশান্তিতে ভরে উঠেছে। ভুলু কথা ক'টি বললো। ঠিক ঐ মুহূর্তে রহমান সেই বিরাটদেহী ভয়ঙ্কর লোকটাকে পাকড়াও করে নিয়ে হাজির হলো সেখানে। কামালের হাত-পা বাঁধা দেহটাকে সে–ই কাঁধে বহন করে

এনেছিলো এবং সেই তাকে পুকুরের ঘাটে নামিয়ে বাক্সের মধ্যে ভরতে উদ্যোগ নিয়েছিলো, আবার সুযোগ নিয়ে সরে পড়েছিলো সেখান থেকে।

রহমানের পিছনে রীনাও এসেছে সেখানে। তার মুখন্ডল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। ফ্যাকাশে মুখে তাকাচ্ছে চারদিকে। ভুলু তাহলে সত্য সত্যই বলেছিলো, আজ খোন্দকার বাড়ির রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

রীনা অবাক চোখে দেখলো ভুলুর হাতেও রিভলভার। সে রিভলভারখানা চেপে ধরে আছে চোখমুখ আবৃত এক আলখেল্লাধারীর পাঁজরে।

আলখেল্লার মধ্যে চোখ দুটো জ্বলছে আলখেল্লাধারীর! কে এই আলখেল্লাধারী?

ভুলু বললো–ইন্সপেক্টার, খোন্দকার বাড়ির অশান্তির অধিনায়ক এই মহান ব্যক্তির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিন।

ইন্সপেক্টার কিবরিয়া একজন পুলিশকে ইংগিত করলেন হাতকড়া পরিয়ে দেবার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পরানো হলো আলখেল্লাধারী ও তার সহকারী ছায়ামূর্তি–বেশী বিরাটদেহী সেই জমকালো নিগ্রো ব্যক্তিটার হাতে।

এখন আরও লোকজন সেখানে এনে পড়েছে। আরও আলো এসেছে। চারদিক আলোতে আলোময় হয়ে উঠেছে। সবকিছু স্পষ্ট নজরে পড়ছে।

হাতকড়া পরানো হলেই ভুলু তার রিভলভার সরিয়ে নিলো। তারপর একটানে খুলে ফেললো আলখেল্লাধারীর মুখের আবরণ।

সবাই একেবারে বিস্ময়ে থ’ বনে গেলো।

জামাল সাহেব প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন–আবদুল্লা তুই।

খোন্দকার আবদুল্লাহ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। কে যেন তার মুখে একপপাঁচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে।

চারিদিকে গুঞ্জনধ্বনি উঠলো।

মিঃ আহমদ আলী বললেন–আশ্চর্য, যাকে আমরা সব থেকে সরল সহজ ব্যক্তি মনে করেছিলাম সেই খোন্দকার আবদুল্লাহ খোন্দকার বাড়ির ষড়যন্ত্রকারী……

শুধু ষড়যন্ত্রকারীই নয়, খোন্দকার বাড়ির অভিশাপ। মিঃ কিবরিয়া, মিঃ আহমদ আলী, আপনারা ঠিক সময়মত এসে পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই আমি সক্ষম হয়েছি একে আটক করতে, নাহলে হয়তো বিফল হতাম।

মিঃ কিবরিয়া হাত বাড়িয়ে বললেন–মিঃ আলম, আপনি ভুলুর ছদ্মবেশ ধারণ করে সূক্ষভাবে কাজ সমাধা করলেন, এ জন্য আপনাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভুলু তখন তার নকল দাড়ি–গোঁফ এবং মাথার উষ্কখুষ্ক পরচুলা খুলে ফেলে মিঃ কিবরিয়া এবং পরে মিঃ আহমদ আলীর সঙ্গে করমর্দন করলো।

রীনার দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। ভুলুকে চাকর মনে করে কত না গালাগাল করেছে, কতদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে শাসিয়েছে কিন্তু কি আশ্চর্য, সে-ই মিঃ আলম!

রহমান আর বনহুর দৃষ্টি বিনিময় হলো। বললো বনহুর–আমার বন্ধু রহমানের সহায়তায় আমি এ কাজে এতদূর এগুতে সক্ষম হয়েছি। আমি যখন আমার দেশে গিয়েছিলাম তখন রহমান খোন্দকার বাড়ি এবং মিস রীনার বাড়ির মধ্যে যে একটা সুড়ঙ্গপথ ছিলো বা আছে তা আবিষ্কার করেছে। আপনারা জানেন না এই খোন্দকার বাড়ি একদিন এক সকাপালিক সন্ন্যাসীর আস্তানা ছিলো। সে ভদ্রসমাজে সত্য মানুষ সেজে বসবাস করতে কিন্তু রাতের অন্ধকারে চলতো তার ভয়ঙ্কর যোগসাধনা। প্রতিরাতে সেই কাপালিক নরবলি দিয়ে তার সাধনার সিদ্ধিলাভ করতে। কাপালিক সন্ন্যাসী এমনভাবে এই বাড়িখানা তৈরি করেছিলো যেন বাইরে থেকে কেউ কোনোকিছু বুঝতে না পারে বা সন্দেহ করতে না পারে। কিন্তু এ বাড়ির তলদেশে আছে এক গভীর রহস্যপুরী।

মিঃ কিবরিয়া বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন–এই খোন্দকার বাড়ি তলদেশে আছে এক গভীর রহস্যপুরী–বলেন কি মিঃ আলম!

হাঁ, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন দেখতে পাবেন সবকিছু। বাগানবাড়ির সেই অদ্ভুত আলোকরশি। কোথা থেকে সৃষ্টি হতো–পুকুরের পানিতে কেন এত তর্জন গর্জন আলোড়ন হতো আর খোন্দকার খবির সাহেব ও দারোয়ান এরা সবাইকে আপনারা দেখতে পাবেন সেখানে।

জামাল সাহেব এতক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়র মত থ' হয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন এবং দেখছিলেন। তিনি সহোদর খবির সাহেবের কথা শুনতেই আনন্দধ্বনি করে উঠলেন–আমার বড় ভাইয়া বেচে আছেন? তাকে আমরা ফিরে পাবো? মিঃ আলম– বলুন বড় ভাইয়াকে আবার আমার ফিরে পাবো?

হাঁ পাবেন এবং চাকর–চাকরাণী ও দারোয়ান সবাইকে পাবেন। আপনারই মেজো ভাই খোন্দকার আবদুল্লাহ সাহেবই খোন্দকার খবির সাহেব এবং দারোয়ানদের সরিয়ে ছিলেন এবং খোন্দকার বাড়ির সবাইকে সরিয়ে তিনি নিজে এ বাড়ির একচ্ছত্র অধিপতি হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন কিন্তু সে সুযোগ তার হলো না...বনহুর তাকালো খোন্দকার আবদুল্লাহ সাহেবের দিকে।

হাতে হাতকড়া, মাঝায় দড়ি খোন্দকার আবদুল্লা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, তার মুখমন্ডল রাগে–দুঃখে কঠিন হয়ে উঠেছে।

বনহুর তাকালো এবার সেই ভীষণ চেহারার লোকটার দিকে, তার হাতেও হাতকড়া এবং মাজায় দড়ি পড়েছে।

বনহুর বললো–আর এই নিগ্রো ব্যক্তি হলো আবদুল্লাহ সাহেবের দক্ষিণ হাত। এর সহায়তায় তিনি কুকর্ম সমাধা করতেন। অবশ্য এই নিগ্রো ব্যক্তি সেই কাপালিক সন্ন্যাসীর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলো। খোন্দকার আবদুল্লাহ এর সন্ধান পান এবং এর কাছেই পান তিনি খোকার বাড়ির তলদেশের গভীর রহস্যের সন্ধান...একটু থেমে বললো বনহুর–আসুন স্বচক্ষে সবকিছু দেখবেন। আসুন মিস রীনা।

সবাই বনহুরকে অনুসরণ করলো।

খোন্দকার আবদুল্লাহ আর সেই নিগ্রো ব্যক্তিটিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে পুলিশ বাহিনী পুলিশ ভ্যানে উঠে বসলো।

বাগানবাড়ির মধ্যে একটি বড় শালবৃক্ষের গুঁড়ির পাশে এসে থামলো বনহুর। গুঁড়ির গায়ে একটি সুইচের মত যন্ত্র ছিলো, বনহুর সুইচে চাপ দিতেই গাছের গুঁড়ির খানিকটা অংশ সরে গেলো। সবাই বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখলো শালগাছটার গুঁড়ির ভিতরের অংশে রয়েছে কয়েকটি সুইচ বনহুর বললো– বাগানবাড়ির সেই ভয়াল আলোকরশ্মি সৃষ্টি হতো এই সুইচগুলো দ্বারা…..আরও রহস্য লুকিয়ে আছে এই বৃক্ষের তলদেশে কেউ জানে না…….

[পরবর্তী বই গর্জিলা ও দস্যু বনহুর]



**পূর্ববর্তী:**

« ৬.০৮ রহস্য গুহা

**পরবর্তী:**

৬.১০ গর্জিলা ও দস্যু বনহুর »